পিসীমার গল্প।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত-প্রণীত।

কলিকাতা,

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রাঙ্কণ।

সন ১৩২১ সাল।

মূল্য ||৵০ দশ আনা।

Printed by J. N. De, at the
BANI PRESS.
63, Nimtola Street, Calcutta
1914.

সূচী।

পিসীমার গল্প।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত-প্রণীত।

কলিকাতা,
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রাঙ্কণ।

সন ১৩২১ সাল।

মূল্য ।৶০ দশ আনা।

Printed by J. N. De, at the
BANI PRESS.
63, Nimtola Street, Calcutta.
1914.

সূচী।



পিসীমার গল্প ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বাঘের বিয়ে ।

সন্ধ্যাকালে পিসীমা জপের মালা ঘুরাইতেছিলেন, এমন সময় শান্তি, সরলা, শশীমুখী প্রভৃতি মেয়েগুলি এসে তাঁকে ঘেরে বসে বল্লে, "পিসী মা, আজ একটা ভাল গল্প বলুন—যেন আমাদের হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল ধরে।"

পিসি মা ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রণাম করে, মালাছড়াটীকে দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে রেখে, ভাইঝিগুলিকে বল্লেন—"হাসবার গল্প তোমরা বুঝতে পারবে ?"

সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল—"কেন বুঝবো না—কেন বুঝবো না।" পিসীমা বল্লেন, আজ আমি তোমাদিকে "বাঘের বিয়ের" একটা গল্প বলবো, সবাই মন দিয়ে শুন।

পিসী মা গল্প আরম্ভ কল্লেন।—বাঘ ভয়ঙ্কর জন্তু, বনে বাস

কুরে, বরাহ হরিণ মহিষ ছাগল গাড়ল ও আর আর নানা জন্তুকে মেরে খায়। দুর্দান্ত বাঘকে সকলে ভয় করে, কিন্তু বাঘেরও প্রাণের ভয় আছে, এজন্য লোকালয়ে প্রায় আসে না, আসিলে মানুষ ঘরের বাহির হয় না। এক সময়ে একটা বাঘ বন থেকে বেরিয়ে গ্রামে আসে, সেই সময়ে এক বর বাদ্য বাজনা করে বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছিল, ঢোলের সঙ্গতে শানাই বাজ্‌ছিল, আরও নানা রকম সুমিষ্ট বাজনার কথা কত বলবো। গান বাজনায় কার না মন ভিজে? সাপ এত যে হিংস্র, সেও মধুর সঙ্গীত শুনে ফণা ধরে স্থির হয়ে থাকে। বাঘ সঙ্গীতে মজিল, বরযাত্রীদিগে তাড়া কল্লে না। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শানাইএর গান আর ঢোলের বাজনা শুনে দূরে একটা শিয়াল যাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা কল্লে, "ভাই শিয়াল, কেন এত বাদ্দি বাজনা হচ্চে?"

শিয়াল বল্লে, বর পাল্কী করে বিয়ে কত্তে যাচ্চে দেখছ না?

কথাটা শুনে বাঘের বিয়ে কত্তে বড়ই সাধ হলো, শিয়ালকে বল্লে—ভাই শিয়াল, আজি থেকে তুমি আমার সেঙ্গাত হ'লে, আমাকে ভয় নাই, তুমি ভাই মানুষের কাছে থাক, মানুষের আচরণ বেশ জান, আমার বিয়ে কত্তে বড় সাধ হয়েছে; তোমাকে তার আয়োজন অনুষ্ঠান করে দিতে হবে—যদি আমার বিয়ে দিতে পার, আমি পুরুষানুক্রমে তোমার বেচাকেনার মধ্যে হয়ে থাকবো।

শিয়াল পশুর মধ্যে বড় চতুর—সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, "তার আর ভাবনা কি—আমি তোমার সম্বন্ধ করে বিয়ে দিব। কিন্তু এখন যা বলবো তাই কত্তে হ'বে।"

বাঘ উত্তর কল্লে—"নিশ্চয় ; তুমি যখন ঘটক, তখন তোমার কথা না শুন্‌লে চলবে কেন ?"

বাঘ বল্লে—তবে চল ভাই, তুমি কোথায় থাক আমাকে তোমার গর্ত্ত দেখিয়ে দাও—আমি মধ্যে মধ্যে তোমার ছেলে-পিলেদের ও শিয়ালিনীর জন্যে খাবার দাবার যখন যা ভাল পাবো এনে দিব, আমার কত জিনিষ পত্র নষ্ট হ'য়ে যায়, আমার বাঘিনী নাই, ছেলে পিলেও নাই, কে খাবে ?

শিয়াল বাঘকে সঙ্গে করে নিয়ে আপনার গর্ত্ত দেখাইয়া দিল। শিয়ালিনী আপন স্বামীকে বাঘের সঙ্গে আস্‌তে দেখে আশ্চর্য্যভাবে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো, শৃগাল গর্ত্তে প্রবেশ কল্লে—শিয়ালিনী জিজ্ঞাসিল—"কেমন করে তোমার বাঘের সঙ্গে ভাব হ'লো ?"

শিয়াল পত্নীকে সকল কথা খুলে বলিল, আর তাহাকে সতর্ক করে দিল, ছেলেরা যেন কখন বাঘের সম্মুখে না যায়, কি জানি, কোন্ দিন কি করবে ? আপনাদের সাবধান থাকা ভাল।

শিয়ালনী বল্লে—কেমন করে তুমি বাঘের বিয়ে দিবে, বাঘিনীই বা কেমন করে মিলাবে ?

শিয়াল উত্তর কল্লে—বুদ্ধি থাক্‌লে কি না হয়।

এইরূপে কিছুদিন যায়, বাঘতো খাবার জিনিষে শিয়ালের ঘর পূরিয়ে দিলে, বাঘের খোরাক শৃগাল খেয়ে ফুরুবে কেমন করে ! একটা হরিণে বাঘের একবার একদিনও কুলায় না, কিন্তু শিয়ালের সগোষ্ঠি পরিবার খেয়ে ফুরুতে পারে না। ঘটক শিয়াল আপনার জ্ঞাতি গোত্রজ যে যেখানে আছে,

শিয়াল পাড়ায় পচা গন্ধ ছুটিল, সে দিক দিয়ে চলবার উপায় রইলো না।

শিয়াল আজ নয় কাল—কাল নয় পরশু করে ছমাস কাটিয়ে দিল, ক্রমে বাঘ বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। যখন শিয়াল বুঝিল যে, আর ওজর চলে না, তখন একদিন কয়েক জন গুণ্ডাকে জড়ো করে কিছু টাকা দিয়ে সব কথা খুলে বল্লে। বাঘের কল্যাণে শিয়ালের টাকা পয়সা মোহর গিনির অভাব ছিল না। গুণ্ডাগুলা বল্লে—"বাঘকে যা বলবো তাই শুনবে তো?

শিয়াল বল্লে—তোমাদের কিছু ভয় নাই। বিয়ের লোভে বাঘ পোষ মেনে গেছে। সব ঠিক ঠাক করে শিয়াল বাঘকে বল্লে—"ভাই সেঙ্গাত, মানুষ বড় ভয়ঙ্কর জন্তু, তোমাকে তাদের ভয় হয়, অথচ তারা না হ'লে বিয়েই হবার নয়, আমরা পশুপক্ষী বিয়ের কি বুঝি, কি জানি বল না?—ওরাই বাজাবে, ওরাই নাচবে, ওরাই গাইবে, তবেত বিয়ে হবে?"

বাঘ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বল্লে—তা'তো বটেই? আমরা পশু, মানুষ বিয়ের কি জানি বল না? আজ ধরচি, কাল ছাড়চি, আমাদের পশু জেতের ত এই ব্যবস্থা।

শিয়াল গুণ্ডাদিগে খবর দিল, তারা একটা খুব শক্ত বোরা নিয়ে বাঘ ও শিয়ালের কাছে এলো, বোরার মুখ খুলে দিয়ে বাঘকে তাতে প্রবেশ কত্তে বল্লে, বাঘ কোন আপত্তি না করে বোরায় প্রবেশ মাত্র গুণ্ডাসব গিয়ে আচ্ছা করে বোরার মুখ বন্ধ করে, বড় বড় বাঁশের টুকরা দিয়ে বিলক্ষণ প্রহার

বাঘ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বল্লে—ভাই শিয়াল সেঙ্গাত, এই কি তোমার বিয়ে দেওয়া ?"

শিয়াল বল্লে, "ভাই বাঘ সেঙ্গাত, এই হচ্চে বিয়ের অধিবাস, অধিবাস না হলে কি বিয়ে হয় ?"

বাঘ যখন নির্জীব হয়ে পড়লো, আর নড়ে চড়ে না, তখন গুণ্ডারা সকলে মিলে বোরা শুদ্ধ বাঘটাকে একটা নদীর জলে ফেলে দিল, বাঘ ভাসতে ভাসতে যায়, তখনও মরে নাই, ক্রমে জল খেয়ে প্রাণের জন্য যতই আটু পাটু কত্তে লাগলো, ততই বোরার মুখ আলগা হ'য়ে গেল, শেষ ছিঁড়ে গেল। বাঘ তখন ভাসতে ভাসতে নদীর তীরে উঠলো, উঠেই দেখে, এক বাঘিনী উপস্থিত। তা'কে দেখে বাঘের আহ্লাদের সীমা নাই। সেদিন সেই সময়ে একটা বরের বিবাহে বাজনা বাজি হচ্ছিল; বাঘ বাঘিনীকে আলিঙ্গন দিয়া বল্লে, শিয়াল সেঙ্গাত বলেছে, আজ আমাদের বিয়ে। বস্—বাঘিনীর সঙ্গে বাঘের বিয়ে হয়ে গেল। বাঘ বাঘিনীকে নিয়ে ঘরকন্না কত্তে লাগলো। বিবাহিত বাঘের বন্ধুবাঘেরা যারা তার বিয়ের সংবাদ রাখিত, তা'রা সকলে তাকে বাঘিনীর সঙ্গে দেখে তাদের যে যে অবিবাহিত ছিল সকলে তাহাকে শিয়াল ঘটকের সঙ্গে মিলাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল। বিবাহিত বাঘ উত্তর করিল, শিয়াল সেঙ্গাতকে জুটিয়ে দিলে, সে বিয়ে নিশ্চিত দেওয়াইবে বটে কিন্তু ভাই অধিবাসে টিকলে হয়।"

দেওয়ান ও রাজগুরু।

হিন্দুরাজত্বে রাজার অমাত্যের নাম ছিল মন্ত্রী, মুসলমান রাজত্বে ছিল দেওয়ান—সে নাম এখনও লোপ পায় নাই, কোথাও কোথাও আছে; কিন্তু আর বেশী দিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না—অতঃপর তাঁহার নাম হইবে, হয় সেক্রেটারী, না হয় ম্যানেজার। শেষোক্ত নামের চলন আরম্ভ হইয়াছে। যখন দেওয়ান নামটা পূরামাত্রায় প্রচলিত, সেই সময়ের এক দেওয়ানজীর কথাই এই গল্পের প্রধান অবলম্বন। যখন লাঢ় দেশের পশ্চিম সীমান্তের পার্ব্বত্য প্রদেশকে ঝাড়খণ্ড বলা হইত, তখন সেই দেশের কোন রাজা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন—রাজপুত্রের অশৌচাবস্থা গিয়াছে—তিনি নিয়মিতরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, যে সকল কার্য্য নিতান্ত না হইলে নয়, দেওয়ানজী তাঁহার অনুমতি লইয়া তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেওয়ানজী প্রাচীন, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ বলিয়া প্রজা সাধারণে বিশ্বাস করে, সুতরাং বৃদ্ধ রাজার পরলোক প্রস্থানে কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হয় নাই, যে, রাজকার্য্য নির্ব্বাহে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। দেওয়ানজী বিলক্ষণ চতুর, বৃদ্ধরাজা জীবিত থাকিতে তিনি স্বয়ং সমস্ত কাজ নিজে দেখিতেন, শুনিতেন—কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। রাজকর্ম্মচারিদের চালাকী চাতুরী বেশ বুঝিতেন, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যতদূর পারিতেন তাঁহাদের সম্মান রাখিতেন—রাজা কেবলমাত্র

দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে না পারে। এরূপ রাজার অমাত্যও তাহা বুঝিয়া চলিতেন, নিজের স্বার্থও ষোল আনা বজায় করিতেন, এই তাঁহার চালাকী ও চাতুরী—রাজার মন বুঝিয়া চলিতে পারিতেন, তাই তিনি ইষ্টসিদ্ধিতে সমর্থ হইতেন, রাজার গুণেই দেওয়ানজীর সম্মান রক্ষা পাইত।

বৃদ্ধরাজা বড় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন, সেকালের রাজা রাজড়ারা অনেকেই তাহা লইয়া কালযাপন করিতেন। একবার দেখিলেন, রাজ কর্ম্মচারিগণের বড়ই কাজের চাপ পড়িয়াছে, তাহারা সে চাপ গুধরাইয়া উঠিলে রাজা একদিন ছোট বড় সমস্ত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"আরে, তোরা বল্ দেখি—পামড়া পামড়া ফলটী, গায়ে খড়ি উড়ে, লোকে বড়ি দিয়ে খায়, সেটী কি ফল?"

দেওয়ানজী উত্তর করিলেন,—"হুজুর, এ বড় শক্ত সমস্যা, ইহার উত্তর দিতে সময় লাগিবে।"

রাজা বলিলেন—"আচ্ছা, তোদিকে সাত দিন সময় দিলাম, কাহাকেও কাছারীতে আসিতে হইবে না, তোরা ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ্।"

কর্ম্মচারিরা সাত দিন ছুটী পাইয়া যাহার যে অভীপ্সিত কার্য্য ছিল, সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। সপ্তাহান্তে কেহ আসিয়া বলিল—হুজুর, ভাবিয়া চিন্তিয়া কূলকিনারা পাই না। কেহ বলিল—দিবারাত্র ভাবিয়া ভাবিয়া আমার মাথার ব্যারাম জুটিয়াছে। কেহ বলিল—"আমার মাথায় বেদনা না হউক, সাত দিন ঘুমাইতে পারি নাই।"

কাহাকেও ষড়বিন্দু তৈলের ব্যবস্থা করিয়া রাজবৈদ্যকে তাহা বিনামূল্যে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহারা যখন বিদায় লয়, তখন রাজা বলিলেন, "তোরা আচ্ছা ক'রে ভাব—এ সমস্যা গোসাঞির গড়া, সহজে কি তোরা জবাব দিতে পারবি? ভাব—ভাব, ভাল করে ভাব। রাজা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং গোস্বামী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

তাহার পর আরও সাত দিন গেল—কর্ম্মচারিরা সকলেই রাজ কাছারিতে উপস্থিত, রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কোন উত্তর তোরা খাড়া করেছিস কি না? কেহ বলিল, সে ফলটা হচ্চে—কাঁঠাল।"

রাজা বলিলেন—না রে না, গোসাঞির নিজ গড়া কবিতা—তোরা নারবি নারবি।

আর একজন বলিল—"হুজুর, আমি বলচি—আনারস।"

রাজা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"না, তোরা কেহই পারলি না। দেওয়ানজী, তুমি কি বল?"

দেওয়ানজী বলিলেন—"হুজুর লাউ।"

রাজা।—হলো না, হলো না, তোরা নারবি, আমি বলে দি—চালকুমড়া, চালকুমড়া, পামড়া পামড়া নয়?

সকলেই উত্তর করিল—"আজ্ঞা হঁ্যা।"

রাজা।—গায়ে খড়ি উড়ে না কি?

সকলে।—আজ্ঞা হঁ্যা।

রাজা।—লোকে বড়ি দিয়া খায় না? কুমড়া বড়ি।

সকলে।—আজ্ঞা হঁ হঁ্যা।

রাজা।—এটা কি তোদের ...

সকলে।—আজ্ঞা না, হুজুরের রাজবুদ্ধি আর আমাদের সামান্য বুদ্ধি, পার্‌বো কেন ?

(২)

দেওয়ানজীর কন্যাদায় উপস্থিত, রাজবাড়ীর দেওয়ান, মান সম্ভ্রম যথেষ্ট আছে, অবস্থানুযায়ী ব্যয় না করিলে মান রক্ষা হয় না। তাঁহার মনের অভিপ্রায়, আপনি যদি তাহার উপায় করিতে না পারেন, তাহা হইলে রাজাকে জানাইবেন। রাজা শুনিয়াছেন, দেওয়ানজীর কন্যার বিবাহ—সময় নাই, বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে, অথচ দেওয়ানজী রাজাকে জানাইতে কুণ্ঠিত। শীতকাল, মাঘ মাস, সন্ধ্যার পর কুকুর শৃগাল ডাকিতেছে, রাজা দেওয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন—দেওয়ানজী, কুকুর শিয়ালগুলো এরূপ কাতর হইয়া চেঁচাইতেছে কেন বলিতে পার ?

দেওয়ানজী উত্তর করিলেন, "হুজুর, শীতসহ কত্তে না পেরেই উহারা চেঁচাইতেছে। আমরা শীতবস্ত্র খরিদ করি—উহারা ত পারে না ?

রাজা।—ঠিক বলেছ, কত টাকা হ'লে ওদের শীতবস্ত্র হয় ?

দেওয়ান।—আজ্ঞা পাঁচ ছ হাজারের কমে কি কুলায় ?

রাজা।—ঠিক বলেছ। কাল যেন আমি শুন্‌তে পাই যে,সমস্ত শৃগালকে শীতবস্ত্র কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দেওয়ানজী তৎক্ষণাৎ দশ পনেরখানা কম্বল কিনিয়া দশ পনরটা শৃগাল ধরিয়া তাহাদের গায়ের বাঁধিয়া দেওয়াইলেন। বৈকালে রাজা যতক্ষণ বেড়াইবার জন্য বাহির না হয়েন, ততক্ষণ তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখা হইল ; রাজা বাহির হইলে

পৃষ্ঠে কম্বল বাঁধা শৃগালদিগকে দেওয়ানজী ছাড়িয়া দিলেন, রাজার সম্মুখ দিয়া তাহারা ছুটিয়া প্রস্থান করিল—রাজা তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর শুনিলেন—দেওয়ানজীর কন্যার বিবাহে খুব খরচ হইয়াছে, গরিব দুঃখীরা দুহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

শৃগাল নিত্য যেমন সন্ধ্যাকালে ডাকে, সেইরূপ ডাকিতে লাগিল, রাজা দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসিলেন—দেওয়ানজী, শৃগালেরা এখনও চীৎকার করে কেন? দেওয়ানজী উত্তর দিলেন—শীতবস্ত্র পাইয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

এই ঘটনার দুই তিন বৎসর পরে রাজা একদিন দেওয়ানকে বলিলেন—"দেওয়ানজী, খাজনাখানার টাকাগুলা আমার পিতার আমল হইতে শুকাইতে দেওয়া হয় নাই, টাকায় সেওলা ধরিয়া গিয়াছে, মালখানা হইতে বাহির করিয়া শুকাইতে দেওয়া হউক। বৎসরের শেষে খরচ বাদে যত টাকা মালখানায় তোলা হয়, তাহার একটা হিসাব রাখা হয়। অতএব গণিয়া গাঁথিয়া শুকাইবে, আবার গণিয়া গাঁথিয়া তুলিবে। দেওয়ান তাহাই করিলেন। টাকা শুকাইতে দিবার পর গণনায় পাঁচ হাজার টাকা কমিয়া গেল। খাতাঞ্জী রাজাকে এত্তেলা করিলেন—"টাকা শুকাইতে দেওয়ায় পাঁচ হাজার কমিয়া গিয়াছে।" রাজা দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসায় তিনি উত্তর দিলেন, শুক্তি বাদ গিয়াছে। রোকড়ের খাতায় সেইরূপেই খরচ লিখিতে হইবে।

বৃদ্ধরাজা আপনার রাজত্বকাল এইরূপেই কাটাইয়া মৃত্যুকালে দেওয়ানজীকে বলিয়া যান—"দেখ দেওয়ানজি, আমি জানিতাম,

শৃগালকে শীতবস্ত্র দিতে হয় না, টাকারও শুক্তি বাদ যায় না, কিন্তু অতঃপর এরূপ করিলে চাকরী থাকিবে না—সাবধান! রাজপুত্র ইংরাজীনবিশ!

দেওয়ানজী এরূপ প্রভুর পরলোকযাত্রার কাল বিলম্ব নাই দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন—"প্রভু, আপনার উদ্দেশ্য অভিপ্রায় সমস্তই জানিতাম বুঝিতাম, আপনি যে ভৃত্যবৎসল, তাহা জানিয়াই সেরূপ করিতাম; অতঃপর যে আর আহা চলিবে না, তাহাও বুঝিতেছি। অতএব সাবধান হইব।

এই সকল কথার পর রাজা ইষ্টচিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন—কিয়ৎকাল মধ্যেই ভগবানের চিন্তায় তনুত্যাগ করিলেন।

(৩)

রাজার মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে প্রকাশ পাইল। সকলেই তাহা শুনিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। একজন প্রসিদ্ধ প্রতারকের কাণে এ কথা উঠিল। সে ভাবিল, রাজার মৃত্যু উপলক্ষে তাহাকে দশ টাকা উপার্জ্জনের সুযোগ দেখিতে হইবে—প্রতারক ইহা স্থির করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল, দুই তিন দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধান পাইল, দেওয়ানজীই সর্ব্বে-সর্ব্বা, তাঁহাকে হাতগত করিতে না পারিলে কিছু হইবার নহে। বন্দোবস্ত হইলেই তিনি যে হাতে আসিতে পারেন, প্রতারক তাহাও শুনিল। একদিন সায়ংকালে সে কতকগুলি সওগাদ লইয়া দেওয়ানজীর তোষাখানায় প্রবেশ করিল, দেওয়ানজী পরিচয় জিজ্ঞাসিলে প্রতারক আপনাকে ত্রিদিবসুন্দর রায় বলিয়া পরিচয় দিল—নিবাস হুগলী জেলায় নবসুন্দরপুর।

প্রতারক প্রস্তাব করিল—"আমি এই অঞ্চলে অনেকদিন হইতে বাণিজ্য ব্যবসা করি, রাজা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ যত্ন করিতেন, কেনা বেচার সমস্ত টাকা যাহা মজুত থাকিবার তাহা রাজার কাছেই রাখিতাম, রাজা আপনাকে দিয়া পৃথক তহবিলে তাহা রাখিয়া দিতেন, আমার দরকার মত লইতাম। শেষবারে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিবার পরই তাঁহার স্বর্গ-লাভ হয়, তাহা আমি পাই না। ইহাতে আপনি একটু পোষকতা করিলেই আমার সব সার্থক হয়, আপনাকে হাজারটী টাকা দিই।"

প্রস্তাব শুনিয়া দেওয়ানজীর মনটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—চিরকালের অভ্যাস,রাজার মৃত্যুকালীন একটী কথাতেই ঘুচিবে, এরূপ আশাই করা যায় না। রাজা জীবিত থাকিতে এমন অনেক কাজই তিনি করিয়াছেন। রাজপুত্রের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে এই নূতন পরিচয়, এজন্য তাঁহার মনে একটা খটকা লাগিল। একবারে স্বীকার করিতে পারিলেন না—অথচ লোকটাকে একবারে হাত ছাড়াও করিলেন না। প্রতারক মহা চতুর, সে দেওয়ানজীর মনের ভাব সমস্তই বুঝিল। ফলে আপনার চতুরতার উপর তাহার যে বিশ্বাস-টুকু ছিল, দেওয়ানজীর আশ্বাসবাক্য অপেক্ষা তাহার বল বেশী, এজন্য সে হতাশ হইল না, বুঝিল, একা দেওয়ানজীর সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। চেষ্টান্তর দেখিতে হইবে।

প্রতারক রাজবাড়ীর নিকটেই বাসা লইয়াছে, হাঁড়ি কাড়িয়াছে, বামুন চাকর বাহাল করিয়াছে। প্রতিদিন সকালে বিকালে সহরের চতুর্দিকে ভ্রমিয়া বেড়ায়। অতিথি অভ্যাগত

বাসায় আসিলে খাইতে দেয়। সঙ্গে ছোটছোট গুটী দুই চারি টিনের গোল কৌটা, তন্মধ্যে কতকগুলি আসল ও নকল মুক্তা, লাল নীল সাদা রঙ্গের ঝুটাপাথর, তাহার মধ্যে পৃথক কাগজে মোড়া দুপাঁচখানা আসল পাথরও যে ছিল না এমন নহে; প্রতারক জহরৎওলা বলিয়া সহরের অনেকেরই পরিচিত। সহরটী ছোট খাট—বেশী বড় নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঝাড় খণ্ডের কোন রাজ্যের রাজধানী—সহরের সীমা অতিক্রম করিলেই ছোট ছোট বন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়—সহরের গা বহিয়া হীরারধারে নির্ম্মল জলস্রোত লইয়া একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিতা, তাহার তীরভূমি আম জাম কাঁঠাল লেবু কুল প্রভৃতি নানা জাতীয় ফলকর গাছ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। বেলা অবসান সময়ে সেই স্রোতস্বতী সমীপে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতারক দেখিতে পাইল, তপ্ত-কাঞ্চনকান্তি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাণে পৈতা ঝুলাইয়া একটী কুলগাছের তলায় শৌচে বসিয়াছেন, সম্মুখে একটী জলের ঘটী, তাহার উপর একখানি পাট করা ভিজা গামছা। ফাল্গুন মাস, পক্ষীগণের মহা আড়ম্বর উৎসবের সময়—গাছে গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে তাহারা উড়িয়া বেড়াইতেছে, কোকিল কুহরি-তেছে, পাপিয়া ডাকিতেছে, দোয়েল শীশ টানিতেছে, কোন কোনটা নাচিতে নাচিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে কুলগাছটীর তলায় বসিয়া পক্ষীদের ক্রীড়া-কৌতুক দেখিতেছিলেন, সেই গাছের মাথায় একটা ময়ূর উড়িয়া আসিয়া বসিবামাত্র একটী পাকা কুল ব্রাহ্মণের

দেখিবামাত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তাহাতে লোভ জন্মিল—তিনি কুলটী ঘটীর উপর হইতে হাতে লইয়া সতর্কতার সহিত চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই—প্রতারক কিন্তু খুব সাবধানে একটী সহকারকাণ্ডের অন্তরালে আত্ম গোপন করিয়া দেখিতেছিল।

ব্রাহ্মণ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া যখন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তখন কুলটী বদনে দিলেন, এবং কিয়ৎকাল মধ্যেই তাহা উদরস্থ করিলেন। তাহার পর শৌচকার্য্য শেষ করিয়া নদীর জলে ঘটীটি মাজিয়া ঘসিয়া, একঘটী জল লইলেন এবং অপবিত্র পথের কুটায় পাদস্পর্শ না হয় এরূপ সতর্কতার সহিত বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। পথে তাঁহাকে যে দেখিল, সেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। সহরে তাঁহার মান সম্ভ্রম যথেষ্ট, যেহেতু তিনি রাজগুরু। নামটী তাঁহার বিশ্ববিনোদ সিদ্ধান্তবাগীশ। প্রতারক কুলতলা হইতে তাঁহার অনুবর্ত্তী। রাজগুরু বাড়ী প্রবেশ করিলেন, ইত্যবসরে প্রতারক তাঁহার বহির্বাটীতে আসন গ্রহণ করিল।

(৪)

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পরিচয় লাভাবধি প্রতারক আশ্বস্ত হইয়াছিল। দেওয়ানজীর নিকট যাহা পাইবার আশা ছিল না, এখন সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট তাহা পাইবার আশা জন্মিল। বহির্বাটীতে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবামাত্র রাজগুরু বাহিরে আসিয়া প্রতারককে জিজ্ঞাসিলেন—

"কে বাপু তুমি, কি তোমার প্রয়োজন ?"

প্রতা। আজ্ঞে, আমি একজন জহুরী, হীরা মাণিক মুক্তার,

ব্যবসা করি; অনেকদিন হইতে এখানে যাতায়াত আছে, মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে নাই—আর আপনার মত পবিত্র পুরুষের সহিত আলাপ পরিচয়ের উপযুক্ত নহি বলিয়া, তাহাতে সাহসেও কুলায় নাই। আপনি জ্ঞানী, মুক্তাত্মা মহাপুরুষ, এখন দায়ে পড়িয়া আপনার সহিত পরিচয়ের অধিকারী না হইলেও দুঃসাহসিকতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আপনি ভিন্ন আর কাহার দ্বারা আমি দায়ে উদ্ধার পাইব বলিয়া মনে করি না। এখন আপনার কৃপাভিখারী।

রাজগুরু। আচ্ছা, তোমার কি দায় আমাকে খুলিয়া বল, আমার দ্বারা উপকারের উপায় থাকে, নিশ্চয় করিব।

প্রতা। আপনি সে পক্ষে সকলের প্রতি কৃপাবান জানিয়াই আপনার নিকটস্থ হইয়াছি।

রাজ। বেশ কথা—বল, আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি, করিবার হয় করিব।

প্রতা। স্বর্গীয় রাজা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ যত্ন করিতেন; জহরৎ বেচিয়া যখন যাহা পাইতাম, তাঁহার নিকট জমা দিতাম। তাহার পৃথক হিসাব থাকিত না। তাঁহার স্বর্গারোহণের সাত অষ্টদিন আগে পাঁচ হাজার টাকা তাঁহাকে দিয়া দেহাত গিয়াছিলাম। আসিয়া শুনিলাম, তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। আপনার প্রণামীর যথেষ্ট ব্যবস্থা হইবে, আপনি যদি ঐ টাকাগুলি দেওয়াইবার কোন ব্যবস্থা করেন।

রাজ। দেওয়ানজীর কাছে গিয়াছিলে?

প্রতা। আপনি গুরু, আপনার কাছে মিথ্যা বলিব কেন?

রাজ। তিনি কি বলিলেন ?

প্রতা। তিনি আশা না দিয়াছেন, এমন নহে, তবে আমি তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে বুঝিলাম তিনি যেন একাকী এতটা দায়িত্ব লইতে সাহসী নহেন, কালবিলম্বের ভাব—

রাজ। নূতন রাজাকে এখনও তিনি বেশ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মৃত্যুকালে রাজা তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কখনই উচিত নহে।

প্রতা। সে কথাটা আমি খুব গোপনে শুনিয়াই আপনার নিকটস্থ হইয়াছি।

রাজ। বুদ্ধিমানেরই কাজ করা হইয়াছে। কি জান্‌লে, যতই অসম্ভব হউক, গুরু আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। আমি "হাঁ" বলিলে "না" হওয়া আজি বলিয়া নহে—কোন কালেই সম্ভব নহে। আমি বলি, নগদ টাকা গচ্ছিতের কথা না বলিয়া জহরৎ খরিদের কথা বল না কেন ?

এই কথা কর্ণগোচর করিবামাত্র প্রতারকের বক্ষঃস্থল সাহসে উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল, সে ভাবিল,—এতদিনে আশা বসিল, আর লাভ না হইয়া যায় না, রাজগুরুকে বলিল,—

"দেখুন, তাহাতে অনেক কথা উঠিবে, জমা খরচের খাতা তলব হইবে, খাজনাখানায় সেই জহরৎ আছে কি না তাহার অনুসন্ধান হইবে, নানা গোল উঠিবে। তবে আপনি যদি সে সকল গোল মিটাইবার ভার লন, না হয় তাই বলা যায়।"

রাজ। জমা খরচের খাতা কেন তলব হইবে ? যেদিন টাকা খরচ লেখা হইবে, সেই দিনইত জহরৎ খরিদের উল্লেখ

থাকিবে, তবে নূতন খরিদা জহরতের অনুসন্ধান হইবার সম্ভাবনা বটে—তোমার পথই সুগম, অতএব তাহাই গ্রাহ্য। তা বেশ, আমি বলিব—আমার সমক্ষে টাকা গচ্ছিত দেওয়া হইয়াছিল। এখন প্রণামীর ব্যবস্থাটা ঠিক করিয়া ফেল।

প্রতা। দেওয়ানজী মহাশয়কেও নিরাশ করা যাইতে পারে না।

রাজ। কোন মতেই নয়।

প্রতা। আপনিই বিবেচনা মত একটা ঠিক করে দিন না?

রাজ। আমার কথা যদি বলে, তাহা হইলে আমি বলি, "তদর্দ্ধং মদর্দ্ধং।"

প্রতা। তাহা হইলে আর আমার কি থাকে?

রাজ। আড়াই হাজার।

প্রতা। দেওয়ানজী মহাশয়কে আগেই এক হাজার দিবার ঠিক করিয়াছি।

রাজ। দেওয়ানজীকে অত কেন, ইহাতে তাঁহার [illegible] বর্দ্ধিতে পারে—তাঁহাকে ত কিছু আর করিতে হইতেছে না।

প্রতা। বাধা জন্মাইতে পারেন ত?

রাজ। তাহা না জন্মাইবার জন্য পাঁচশতই যথেষ্ট।

প্রতা। সেটা আপনিই বিবেচনা করুন।

রাজ। আচ্ছা, তোমার ইচ্ছাটা কি?

প্রতা। আমার ইচ্ছা—দেওয়ানজী যত, আপনিও তত দেখুন, আপনাদের অনেক সুযোগ ঘটিবে, আমি [illegible] দূর দেশ হইতে আসিয়াছি, আপনাদের নাম করিব, ইহাতেই

রাজ। আচ্ছা,—তা'তেই যদি তুমি তুষ্ট হও তাই দিবে।

প্রতা। তাহা হইলে কোন্ দিন দরবারে আর্জি দিব?

রাজ। "শুভস্য শীঘ্রং।" কাল সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী, দিনটা ভালই আছে।

প্রতা। যে আজ্ঞা, তবে কাল একবার রাজসভায় যেন পদার্পণ হয়।

রাজ। কি রকমে কি কল্লে ভাল হয়, তুমি কাল প্রাতে আসিলে ঠিক করা যাবে।

প্রতা। যে আজ্ঞা, তাই ভাল।

এই বলিয়া প্রতারক রাজগুরুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, প্রণামের পর তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া বিদায় লইল।

(৫)

প্রতারক বাসায় আসিয়া মনে মনে নানা বিষয়ের তোলা পাড়া করিতে লাগিল। পরহস্তগত ধন যতক্ষণ হাতে না আসে, ততক্ষণ বিশ্বাস নাই। তাহার মন এখনও নিশ্চিন্ত নহে, বরং চিন্তা বাড়িল। কি করিলে টাকাগুলি শীঘ্র হস্তগত হয়, এখন তাহাই তাহার মনে হইতে লাগিল। রাত্রিতে তাহার ভাল রকম ঘুম হইল না, কেবলই ভাবনা।

ভালয় ভালয় রাত্রি প্রভাত হইল। প্রতারক শয্যা ত্যাগ করিয়া, মুখ হাত ধুইল, তাহার পর রাজগুরুর সহিত নানা আলোচনা আন্দোলনের পর অবধারিত হইল, রাজসভার নিয়মানুসারে লিখিত দরখাস্ত দেওয়া হইবে। দরখাস্তের মুসাবিদাও প্রস্তুত হইয়া গেল। প্রতারক বাসায় আসিয়া

একখানি পরিষ্কার কাগজে তাহা নকল করিল। সন্ধ্যার পর রাজা সভায় বসেন, সেই, সময়ে যাহার যে প্রার্থনা আছে, তাহা লিখিয়া দেওয়ানজীর হাতে দিলে, তিনি তাহা রাজাকে শুনাইলে পর, তিনি তবে উপযুক্ত হুকুম দিয়া সভাভঙ্গ করেন। আহারাদি করিয়া প্রতারক দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা তাঁহার সুগোচর করিল। দেওয়ানজী একটু কৌতু পাড়িয়া বলিলেন,—

"ভালই হইয়াছে। গুরু ঠাকুরের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হয়-ভালই, কিন্তু আমার সম্বন্ধে যেন বিবেচনার ক্রুটী না হয়।"

প্রতারক বলিল,—"কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না।"

এই বলিয়া যথারীতি নমস্কার করিয়া প্রতারক বাসায় ফিরিল। সূর্য্যাস্ত হইল, দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, রাজা সভায় বসিবার পূর্ব্বে দেবতার আরতি দেখিয়া দেবতার নির্ম্মাল্য গ্রহণ করেন, তাহার পর সভায় আসিয়া বসেন। সেদিনও তাহাই হইল। জহুরী ত্রিদিবসুন্দর দরখাস্ত হাতে সভায় উপস্থিত হইল। অনেক লোকই সেইরূপে উপস্থিত। একে একে সকলেই পেস্কারের হাতে দরখাস্ত দিল, জহুরীও দিল। তখনও রাজগুরুর আগমন হয় নাই—রাজা তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন. দেওয়ানজী পূর্ব্বদিনের হুকুমী কাগজে রাজার সহী নিশান করাইতে ছিলেন—এমন সময় রাজগুরু আসিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল, রাজাও আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। রাজগুরু আসন পরিগ্রহ করিলে রাজা তাঁহার

প্রতারকের দিকে রাজগুরুর দৃষ্টিমাত্র তিনি বহুকালের পরিচিতের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কিহে, ত্রিদিবসুন্দর যে?"

প্রতা। আজ্ঞা—হাঁ।

রাজ। স্বর্গীয় রাজার পরলোকের পর তুমি কি আজ সর্ব্ব প্রথম সভায় আসিয়াছ না কি? টাকাগুলি পাইয়াছ?

প্রতা। আজ্ঞা হাঁ, আজিই সব প্রথম আসা, টাকাগুলির জন্যই আসা।

রাজা পেস্কারের মুখে দরখাস্ত শুনিবার আগেই গুরুকে জিজ্ঞাসিলেন—

"কিসের টাকা?"

সিদ্ধান্তবাগীশ জানা ঘটনার ন্যায় প্রতারকের সমস্ত কথা রাজাকে শুনাইয়া দিলে রাজা কেবলমাত্র জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি তৎকালে রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন?"

রাজগুরু অম্লানবদনে উত্তর দিলেন,—

"হাঁ, বোধ হয় দেওয়ানজীই এবিষয় অনবগত নহে।"

দেওয়ানজী "হাঁ" বা "না" বলিবার আগেই রাজা বলিলেন,—

"কর্ত্তার আমলের যাহা কিছু দেনা পাওনা আছে, যত শীঘ্র সম্ভব মিটাইয়া দেওয়া আমার ইচ্ছা—এরকম কথা যেন আর আমাকে শুনিতে না হয়। এজন্য আমি একটী সপ্তাহ সময় দিলাম। তাহার পরে কাহার কোন কথা শুনিব না।

ইহাতে দেওয়ানজীর অনেক ইষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি হইয়া গেল।

করিল। সভাভঙ্গের পর প্রতারক দেওয়ানজীর বাড়ীতে গেল, দেওয়ানজী তৎপর দিবস যাইতে বলিলেন, প্রতারকও যথানিয়মে উপস্থিত হইল, কিন্তু কাজ মিটিল না। এইরূপে আজি নয় কাল করিয়া, তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। দেওয়ানজী কোন রকমে আড়াই হাজারের কমে রাজি নহেন।

প্রতারক বলিল—"দেখুন দেওয়ানজী মহাশয়, আমার দ্বারা আপনার অনেক কাজ খোলসা হইয়া গিয়াছে, তাহা বেশ যখন বুঝিতে পারিতেছেন, তখন আমাকে কষ্ট দিবেন না। আপনাকে অর্দ্ধেক ও গুরুজীকে হাজার দিলে আমি কিসের জন্য এতটা করিলাম?"

দেও। তোমার ত ষোল কড়াই কাণা, যা পাও তাই যথেষ্ট মনে করিয়া চলিয়া যাইতে রাজি হও, আজিই মিটিয়া যায়।

প্রতা। আজ্ঞে তা হলে আমার কিছু থাকে না।

দেও। মনে করো না যে, রাজা সাত দিনের কথা বলিয়া দিয়াছেন বলিয়া সাত দিনেই মিটিয়া যাইবে, আমরা বয়স ভোর আমলাগিরি করিতেছি, তোমার চেয়ে অনেক জানি শুনি—আমাদেরও এমন কৌশল আছে যে, সাত দিন সাত মাস কি সাত বছরেও তোমার কাজ মিটিবে না—ভাল চাও ত রাজি হও।

প্রতারক প্রমাদ গণিল—শেষ দেওয়ানজীর হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে দেড় হাজারে রাজি করিল। সেইদিনই টাকা মিলিল। দেওয়ানজী আপনার পাওনা কাটিয়া লইয়া সাড়ে তিন হাজার টাকা প্রতারকের হাতে দিলেন। প্রতারক সেই

(৬)

রাজবাড়ী হইতে বিদায় পাইতে বেলাবসান হইল। প্রতারকের ইচ্ছা ছিল, সেইদিনই সহর ছাড়িয়া চলিয়া আইসে, কি জানি, বিলম্বে যদি কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রতারকের প্রধান সহায় রাজগুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ হয় নাই। প্রতারক ত্রিদিবসুন্দর রাত্রি শেষে রওনা হইবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সন্ধ্যার পর রাজগুরুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল, কয়েকদিন যাতায়াতে প্রতারকের সহিত গুরুজীর ভৃত্য ভৃত্যানিদের সকলের সহিত জানা শুনা হইয়া গিয়াছিল। ত্রিদিবসুন্দর গুরুজীর অন্তঃপুরের খাস চাকরাণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসায় জানিল, তিনি সন্ধ্যাবন্দনায় বসিয়াছেন। প্রতারক তাহাকে বলিল যে—"আমি আজ রাত্রিতেই বাড়ী যাইব, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।" রাজগুরু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ভাবিতেছিলেন—ত্রিদিব ভাগিল না কি? তাহার পর সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিয়া কাণ পাতিয়াছিলেন, বাড়ীর কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিলে, গাছের পাতাটী পড়িলে ত্রিদিব আসিল কি না, ঝিকে বাড়ীতে পাঠাইয়া খবর লইতেছিলেন। ইতিমধ্যে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র তাড়াতাড়ি "যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ" ইত্যাদি গুহ্যাতিগুহ্য মন্ত্রটী আবৃত্তি করিয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঝিকে বৈঠকখানার কপাট খুলিয়া দিবার অনুমতি করিলেন। ঝি আজ্ঞামাত্র কপাট খুলিয়া দিয়া তৎসংবাদ প্রভুকে জানাইল। রাজগুরু ত্রিদিবের হাতটী ধরিয়া বৈঠকখানায় প্রবিষ্ট হইয়া উভয়ের আসন পরিগ্রহ মাত্র ত্রিদিব আপনার বগল হইতে একটী বুচকি বাহির

করিয়া তাহা হইতে একটী বোতল উগ্রবীর্য্য সুরা, ভর্জ্জিত হংসডিম্ব, চারিটী বাটা মাছ ভাজা বাহির করিয়া একটী পাত্রে রাখিবামাত্র রাজগুরু আশ্চর্য্যভাবে কিয়ৎকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন, তাহার পরে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমার যে একাজ হয়, তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

প্রতারক উত্তর করিল,—

আপনার কুলতলায় দেখিছি আচার,
রাজসভায় বিচার,
এ কাজ আপনার হবে না ত আর হবে কার।"

রাজগুরু আপত্তিটী করিলেন না, কেবল বলিলেন—"দেখো যেন প্রকাশ পায় না।"

প্রতা। আজ্ঞা প্রাণান্তে না।

অতঃপর রাজগুরুর পরিতোষ সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রতারক বিদায় লইল।

খুড়াভাইপো।

বিন্ধ্যাচলের নিকট বিজয়পুরে এক শিল্পী ছিল, তাহার নাম দশকর্ম্মা—সে ভাল ভাল পুতুল গড়িতে, ভাল ভাল ছবি লিখ্‌তে পারতো। সে একটা গোলক ধাঁধা তৈয়ারি করেছিল, তাহার ভিতর যে ঢুকিত, সে আর বাহিরে আসবার পথ খুঁজে পাইত না। আশ্চর্য্য ঘর। শুনেছি, বর্দ্ধমানের মহারাজার নাকি সেই রকম একটা গোলক ধাঁধা ছিল, এখন আর নাই।

দশকর্ম্মা শুনিল,—দ্রাবিড় দেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম মনোমদ। রাজা মনোমদের একটা ভয়ানক রাক্ষস ছিল, রাক্ষসটার নাম ভয়ভঞ্জন। রাক্ষসের নাম ভয়ভঞ্জন, ইহাতেই বুঝিতে পার যে, নামটা বিদ্রূপজনক, নতুবা রাক্ষসে কি কখন ভয়ভঞ্জন হয়—যার নামেই অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে; ইহারই জন্যে রাজা মনোমদ দশকর্ম্মাকে দিয়া এই গোলক ধাঁধা প্রস্তুত করিয়াছিল। এই গোলক ধাঁধার মাঝখানে একটা খুব বড় খালি জায়গা ছিল, তার পাশেই ভয়ভঞ্জনের ঘর। রাক্ষস সেই ঘরে থাকিত আর খালি জায়গায় পাইচালি ক'রে বেড়াইত। কেহ সেখানে যাইলে আর পথ খুঁজিয়া বাহিরে আস্‌তে পারিত না, ভয়ভঞ্জনের উদরস্থ হইত।

দশকর্ম্মার এক ভাইপো ছিল, তা'র নাম পাঁচকর্ম্মা, তাহাকে লইয়া সে আপনার দেশে ফিরিল। পাঁচকর্ম্মা তা'র খুড়ার কাছে শিল্প শিখিত। খুড়া দশকর্ম্মা তা'কে রীতিমত শিক্ষা দিয়া একজন পাকা শিল্পী করিয়াছিল। এমন কি,

পাঁচকর্ম্মা শিল্পবিদ্যায় খুড়াকে জিতিল। পাঁচকর্ম্মা খুড়ার পসার নষ্ট করিয়া দিল। সংসারে আপন নাম খুব জাহির ক'রে নিল। শিল্প কাজের জন্য সমস্ত দ্রাবিড় দেশে দশকর্ম্মাকে আর কেহ খুঁজিল না, পাঁচকর্ম্মাই সর্ব্বত্র প্রতিবিধি করিতে লাগিল। দেখিয়া, দশকর্ম্মার মনে হিংসা জন্মিল। একদিন খুড়াভাইপো দুজনে এক সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে খুড়া ভাইপোর হাত ধরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। পাঁচকর্ম্মা ডুবিয়া গেল, কিন্তু মরিল না। জল-দেবতারা তাহাকে বাঁচাইল; কিন্তু খুড়ার হিংসা হইতে রক্ষা করিবার জন্যে তাহাকে শঙ্খচিল করিয়া রাখিল।

দশকর্ম্মা ভাবিল, যদি বিজয়পুরের লোক এ কথা শোনে, তা' হ'লে তা'কে খুন করে ফেলিবে। এমতে সে আপন পুত্র আশ্চর্য্যকর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া বিজয়পুর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, আবার দ্রাবিড়ের রাজার আশ্রয় পাইল। এবারে কিন্তু সে রাজার বিরাগভাজন হওয়ায় জেলে গেল। পিতাপুত্র দুইজনেই জেলখানায় থাকে। ক্রমে দশকর্ম্মার তাহা ভাল লাগিল না, পলাইবার চেষ্টায় রহিল। জেলখানার চারিদিকে খুব উচু প্রাচীর। সেখান হইতে পলাইবার পথ নাই। কোন চেষ্টায় পিতা পুত্রে কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না।

একদিন বৈকালে আশ্চর্য্যকর্ম্মা জেলখানার ভিতরের মাঠে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিতে পাইল,—অনেক বড় বড় পাখী আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। শিল্পীর মন ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিল

হইতে পাখীর পালক কুড়াইতে লাগিল। দুই দশদিন মধ্যে পিতাপুত্রের উড়িবার মত পালক সংগ্রহ হইল। তখন আশ্চর্য্যকর্ম্মা পিতাকে আপনার কৌশলের কথা জানাইল, পিতাও সম্মত হইল। তারপর পিতাপুত্রে দুই জোড়া ডানা প্রস্তুত করিল। উড়িয়া পলাইবার দিন ক্ষণ ঠিক হইয়া গেল, কেহ জানিতে পারিল না। পিতাপুত্রে চুপে চুপে সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল। দশকর্ম্মা মোম দিয়া আপনার ও পুত্রের অঙ্গে ডেনা দুই জোড়া লাগাইয়া দিয়া বাতাসে ভর করিবামাত্র জেলখানা হইতে আকাশপথে উঠিল। পিতা পুত্রকে বলিল, সাবধানে উড়িবে, বাতাসে উড়াইয়া সমুদ্রের জলে ডুবাইয়া দেয়,—নীচের দিকে যেমন গাছ পালা, জলা জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বতের ভয়,উচ্চেও তেমনি রৌদ্রের ভয়। রোদে মোম গলিলেই নীচে পড়িয়া যাইতে হইবে। এইরূপ ধীরে ধীরে পিতাপুত্রে আকাশপথে চলিতে চলিতে ঝড় বহিতে লাগিল। তাহাদিগকে ঝড়ে উড়াইয়া সমুদ্রের দিকে লইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে আশ্চর্য্যকর্ম্মা সমুদ্রের জলে ডুবিয়া গেল। পিতা আকাশপথে থাকিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। দশকর্ম্মা ভাবিল, পাঁচকর্ম্মাকে মারিবার ফল হাতে হাতে ফলিল।

কিছুদিন পরেই পুত্রশোকে দশকর্ম্মারও প্রাণ বাহির হইল। দশকর্ম্মার স্ত্রী সাধ্বীসতী রাজকুমারী ভুলেও কখন পাপকর্ম্মে মন দেয় নাই—পতিপুত্রশোকে অতিকষ্টে কালযাপন করিতে থাকে—পুত্রকে মনে পড়িলেই তাহার চক্ষু দুইটী দিয়া জল পড়ে, নাকে দীর্ঘনিশ্বাস বহে। রাজকুমারীর পিতা জলন্দরের রাজা। তাঁহার নাম বিজয়ক্রোপ, তিনি কন্যার অবস্থা-

কথা অবগত হইয়া তাহাকে আপন রাজ্যে লইয়া গিয়া আদর যত্ন করিতে লাগিলেন, অল্প বয়সে আশ্চর্য্যকর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল, বিধবা পুত্রবধূও শাশুড়ীর সঙ্গে জলন্দর গিয়াছিলেন। বধূর বৈধব্যযাতনা ক্রমে রাজকুমারীর অসহ্য হইল, একদিন তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য এক নদীতীরে উপস্থিত হইয়া, গলায় কলস বাঁধিয়া, তাহার পর জলে নামিয়া, কলসী জলপূর্ণ করতঃ জলে ডুবিয়া নিজ প্রাণ বাহির করিবার জন্য তিনি নদীজলে কলসী ডুবাইতে লাগিলেন, এমন সময় জলের ভিতর হইতে শুনিতে পাইলেন—"রাজকুমারি, ডুবিয়া মরিও না, যা'র জন্যে মরিতে যাইতেছ, তাহার সঙ্গে তোমার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে।"

কথাটা শুনিয়া রাজকুমারী আশ্বস্ত হইলেন, জলের কলসী জলে দিয়া আপনার গলার দড়ি খুঁলিয়া ফেলিলেন, এবং অবিলম্বে রাজবাড়ীতে আসিয়া আপনার বধূকে সমস্তই জানাইলেন। বধূ ভাবিলেন—শাশুড়ী ছেলে ছেলে ক'রে পাগল হয়েছেন, মরা মানুষও আবার বাঁচিয়া আসে!

যাহাই হউক, দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, আশ্চর্য্য-কর্ম্মা বাঁচিয়া ফিরিল না, শাশুড়ী বধূ দুই জনেই মনে করিল, দৈববাণী মিথ্যা। শাশুড়ী তখনও একবারে নিরাশ হয়েন নাই, বধূকে বলিলেন—"মা, একটা কথা আছে, সবুরে মেওয়া ফলে, কথাটা একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না। আত্মঘাতীর মহাপাপ, মরিলেই ফুরাইয়া যায়। আরও কিছুদিন দেখা যাউক।"

ভগ্নীকে ছেলেবেলা থেকে বড় ভালবাসতেন, তার বৈধব্য দুঃখে বড়ই কাতর ছিলেন। একদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া একটা হরিণকে ধরিবার জন্য তার পিছু ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন, হরিণ ঘোড়ার সঙ্গে ছুটিতে পারিল না—ধরা দিতে হলো—তখন বেলা দুইপ্রহর, আকাশে সূর্য্যদেব যেন অগ্নি বর্ষণ করিতেছিলেন, রাজপুত্রের চাকর বাকরেরা কোন্ দিকে চলিয়া গিয়াছে, তিনি একাকী, কেমন করিয়া হরিণ লইয়া বাড়ী ফিরিবেন, তা'রই ভাবনায় অস্থির হ'য়ে উঠলেন। বহুপথ হেঁটে গলা শুকিয়ে গিয়াছে—তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইতে হইল, কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কাহার আশ্রয় পাইবেন, এই ভাবনায় তাঁহার মনে নানা অশুভ চিন্তা আসিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল, একখণ্ড শিলার উপর তিনি বসিয়াছিলেন, তাহারই উপর ঘুমাইয়া পড়িলেন। সমস্ত দিন ঘুমাইলেন, ক্ষুধায় তাঁহাকে জাগাইয়া দিল—জাগিয়া দেখেন, সেই হরিণটী পলায় নাই—ঠিক শুইয়া আছে। দেখিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল, হরিণের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে তাঁহার মনে হইল, সে যেন কিছু বলিবে। বাস্তবিক তাহাই হইল, হরিণটী বলিতে লাগিল,—

"রাজপুত্র, আপনার এখানে থাকা হইবে না, অন্যত্র পলায়ন করুন, আপনি যে পাথরখানার উপর শয়ন করিয়া আছেন, উহার নীচে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্তে একটা ভয়ানক অজগর সর্প থাকে, সে বনে চরিতে গিয়াছে, এখনি ফিরিয়া আসিবে, আসিয়া আমাদিগকে দেখ্‌তে পেলে নিশ্চয়

হরিণকে কথা কহিতে দেখিয়া তাঁহার যেমন আশ্চর্য্য বোধ হইল, তেমনি তিনি ভয়েও আচ্ছন্ন হইয়া বলিলেন—

"তবে এখন কি করা যায়, তুমি তাহা বলিয়া দিয়া আমার একটা উপায় কর।"

হরিণ। এখন এখান হ'তে পলাই চলুন, কিন্তু আবার এখানে আসিতে হইবে। আপনি যে জন্যে সদা উৎকণ্ঠিত, তাহা আপনার এইখানেই আছে।

এই বলিয়া হরিণ আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল, আর রাজপুত্র ঘোড়ায় চাপিয়া তাহার পিছু পিছু চলিল। তখনও সূর্য্যঠাকুর অস্ত যান নাই, এমন সময় তাঁহারা একটা প্রকাণ্ড সরোবরের তীরে পৌঁছিলেন। হরিণ রাজপুত্রকে বলিল, ঘোড়া রেখে আমার সঙ্গে জলে নামুন। রাজপুত্র জলে নামিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এক মহল দুই মহল করিয়া সাত মহলে গিয়া দেখিলেন—এক পরমাসুন্দরী কন্যা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত—পরমসুন্দর পট্টবস্ত্রপরিহিত—একটী কাকাতুয়াকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছেন।

কাকাতুয়াও আদর পাইয়া তাঁহার মুখের ভিতর ঠোঁটটি প্রবেশ করাইয়া যেন আহ্লাদে গলিয়া যাইতেছে। হরিণ ও রাজপুত্র সেখানে উপস্থিত হইলে একজন দাসী আসিয়া পা ধোবার জল দিয়ে গেল, সোণার থালে নানাবিধ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাবার আনিয়া সম্মুখে ধরিল। হরিণ যে কোথায় গেল তাহা আর রাজপুত্র দেখিতে পাইলেন না। যাহাই হউক, ক্ষুধা তৃষ্ণায় তিনি এতই কাতর যে তাহার অনুসন্ধান লইবার অবসরও পাইলেন না, আগে খাদ্যদ্রব্য গুলি উদরস্থ করিলেন।

তাহার পরে এক সুন্দরী দাসী আসিয়া তাঁহাকে একটী গৃহে লইয়া গেল। গৃহ মধ্যে সুন্দর পালঙ্কে দুগ্ধফেণনিভ শয্যা—সেই শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি সেই সকল আশ্চর্য্য ঘটনার আলোচনা করিতে করিতে অঘোরে ঘুমাইলেন। সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, তিনি জাগ্রত হইয়া দেখেন, কোথায় বা সেই অট্টালিকা, কোথাই বা সেই গৃহবাসিনী, আর কোথায় বা সেই হরিণ; পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে যে পাথরখানার উপর শয়ন করিয়াছিলেন, তাহারই উপর রহিয়াছেন। সূর্য্যকিরণ পরস্পর শাখা সংলগ্ন বৃক্ষ, পত্রাবচ্ছেদ দিয়া বন মধ্যে যেন সুবর্ণখণ্ড ছড়াইতেছে বলিয়া মনে হইল। তিনি কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখেন, তাঁহার ঘোড়াটী নিকটেই চরিয়া বেড়াইতেছে। হরিণটী বলিয়াছে, যে পাথরের উপর তিনি শয়ন করিয়াছেন, তাহার নীচে একটা অজগর সাপ আছে—সম্ভবতঃ সেটা তখন ছিল না, দিবাভাগে সেখানে থাকে না—রাত্রিকালে আসে—যাহা হউক, তিনি অশ্বারোহণে সেস্থান হইতে পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলেন—কিন্তু পথ খুঁজিয়া মিলিল না—বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত, তথাপি বন হইতে বাহির হইবার পথ পাওয়া গেল না, আর সেই সরোবর মিলিল না।

রাজপুত্র তখন আপনাকে বড় বিপদগ্রস্ত মনে করিলেন, কিন্তু কি করিবেন, কোন উপায়ই হইয়া উঠিল না, হরিণের আর একটা কথা তাঁহার মনে হইল,—হরিণ বলিয়াছে, আপনি যেজন্য উৎকণ্ঠিত, তাহা এইখানেই মিলিবে। তাহাই বা কি—

উপর শয়ন করিলেন। শয়নমাত্র নিদ্রা আসিল, তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন পূর্ব্বদিনের হরিণ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন—তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সত্যই হরিণ তাঁহার নিকটে শুইয়া রহিয়াছে।

রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ দেখিয়া হরিণ জিজ্ঞাসিল—কাল রাত্রিতে আপনার কোন কষ্ট হয় নাই ?

রাজপুত্র বলিলেন—"না, বেশ সুখে ছিলাম।"

হরিণ বলিল—"আজ আবার আপনাকে সেই সরোবরে যাইতে হইবে। এবার বেশী দুর যাইতে হইবে না, অতি নিকটেই।"

এই বলিয়া হরিণ নিমেষ মধ্যে তাঁহাকে সরোবর তীরে উপস্থিত করিল। জলে নামিয়া রাজপুত্র সেই বাড়ী, সেই রমণী সমস্ত দেখিলেন। আজি তাঁহার ভোজন স্থানে তিনি একটী আসন লইয়া বসিলেন। রাজপুত্রের আহারে একটু লজ্জার ভাব দেখিয়া সেই রমণী বলিলেন—"আপনি আমার পরমাত্মীয়, আমাকে লজ্জা করিবেন না, আর একদিন পরে আপনি সমস্তই জানিতে পারিবেন, এখনও সময় হয় নাই—একদিন পরে হইবে।"

রাজপুত্র আশ্চর্য্য হইলেন—পরমাত্মীয় বলায় তাঁহার লজ্জার মাত্রা বাড়িয়া গেল দেখিয়া যুবতী সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। রাজপুত্র আহারাদি সমাপন করিলে দাসী আসিয়া তাঁহাকে শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিবার স্থান দেখাইয়া দিল, তিনি সেখানে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। সায়ংকালে

পশুপক্ষী সমস্ত দেখিতে লাগিলেন—দুই তিন দিন বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছেন—পিতামাতা ভগিনী কতই চিন্তা করিতেছেন, এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, তিনি অট্টালিকায় পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া সেই স্বামিনীকে পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কাকাতুয়া লইয়া আদর করিতে দেখিলেন, দেখিয়া শুনিয়া তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাঁহার মনে নানা চিন্তা উপস্থিত হইল। রাত্রির আহারের পর রাজপুত্র গৃহস্বামিনীকে, বলিলেন,—"আপনি আমাকে দয়া করিয়া যাহাতে আমি স্বস্থানে যাইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করুন।"

এই কথা শুনিয়া গৃহস্বামিনী উত্তর করিলেন—"যেদিনের যা' হইবার তাহাই হইবে, কাহারও চেষ্টায় কিছু হয় না। ফলে আপনার ইচ্ছা শীঘ্র সফল হইবে। এই মাত্র বলিতে পারি।"

সেরাত্রিও সেইরূপে গেল—প্রভাতে সেই শিলাখণ্ডে আপনাকে শায়িত দেখিয়া রাজপুত্র সেই হরিণের চিন্তা করিতে করিতে হরিণ তাঁহার নিকটস্থ হইল। সেদিন তাঁহার বাড়ী ফিরিবার জন্য কাতরতা বেশী, হরিণ যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল—"আপনি যাহা মনে করিতেছেন, আগামী কাল তাহা হইবে, পিতা মাতা বনিতা সকলকেই দেখিতে পাইবেন।

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—আমি যে সকল ঘটনা দেখিতেছি, তাহা যেন আমার ভোজের বাজি বলিয়া মনে হইতেছে। হরিণ কথা কহিতে পারে, ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলই দিব্যচক্ষে দেখিতে পায়, আমি এই সর্ব্ব প্রথম

মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে শিখিলে, যদি কোন আপত্তি না থাকে, আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিবে কি ?"

হরিণ উত্তর করিল—"যদি আজি আমি তাহা প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমাকেও ঐ পাথরটার মত হইয়া যাইতে হইবে। কাজ কি—দুই তিন দিন গিয়াছে, আর একটা দিন বইত নয়। অপেক্ষা করিতে দোষ কি ?"

রাজপুত্র দুঃখিত হইলেন, কেবল এইমাত্র বলিলেন—"আমার জীবনহানির ত কোন সম্ভাবনা নাই ?

হরিণ।—তাহা হইলে প্রথমদিনই হইত। অমঙ্গল যাহা কিছু হইবার হইয়া গিয়াছে। আগামী কল্য প্রাতে আপনি আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না, এক মহাপুরুষ আপনার নিকট আসিবেন, তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবেন। করিলে তিনিই যাহা করিবার করবেন।

সেদিন সন্ধ্যাকালে হরিণ আর রাজপুত্রকে সরোবরের ভিতরের বাড়ীতে লইয়া গেল না, বনের ভিতরেই একটী বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া দিল। সে বাড়ীতে সেই রমণী নাই—বাড়ীটির আসবাব আড়ম্বরও সেরূপ নহে। লোকজন অতি অল্প, যথাকালে একটী স্ত্রীলোক, অন্নব্যঞ্জনাদি আনিল—ক্ষুধার জ্বালায় রাজপুত্র তাহা আহার করিলেন, আহারের পর আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ঘরের মধ্যে একখানি খাটে বিছানা করা ছিল, তাহাতেই শয়ন করিলেন। শয়ন করিবামাত্র আলো নিভিয়া গেল। বাড়ীর নির্জ্জনতায় তাঁহার মনে বড় ভয় হইল—কোন আপদবিপদ

রাত্রি দুই প্রহরের সময় তিনি শুনিতে পাইলেন—কে যেন বলিতে লাগিল—তোমার মা বাপ তোমার জন্যে বড়ই চিন্তাকুল হইয়াছেন, আগামী কল্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহারা তোমাকে দেখ্‌তে না পেলে প্রাণ রাখবেন না। তুমি যেমন করে পার, বাড়ী পৌঁছিবে।"

রাজপুত্র তাহার উত্তর করিলেন—আমিতো আজি কয়েকদিন এখান হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছি, পথ পাইতেছি না, কেমন করিয়া যাই; আপনি যদি কোন মহাপুরুষ হন, আমাকে পথ বলে দি'ন, আমার পিতামাতার প্রাণ রক্ষা হউক।"

সে কথার কোন উত্তর মিলিল না—রাজপুত্রের ঘুম হয় নাই—তিনি বিছানায় পড়িয়া কত ভাবনাই ভাবতে লাগলেন। দ্বিতীয় প্রহরের পর শুনিলেন, আবার যেন কেহ বলিতে লাগিল—বনে তুমি যে পাথরখানার উপর শুইয়াছিলে, সেই পাথরখানাই তোমার ভগ্নিপতি আশ্চর্য্যকর্ম্মা, সে পিতৃদোষে পাষাণ হইয়া আছে।

এই কথায় রাজপুত্রের মনে কৌতুহল জন্মিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কি আর মনুষ্যদেহ পাইবে না, যদি পায় তাহার উপায় কি ?"

এ কথার জবাব পাওয়া গেল না—ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইল, আবার যেন কে বলিতে লাগিল—সরোবরের জলের মধ্যে অট্টালিকায় যে রমণী আর কাকাতুয়া পাখী দেখিয়াছ, সেই তোমার ভগ্নিপতির পিতৃব্য পুত্র, তোমার ভগ্নিপতির পিতা অকারণে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করিয়াছিল, সেই

হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছে। তোমাকে পাইলেই খাইয়া ফেলিবে হরিণতী সরোবরের ভিতর যে রাজকন্যা আছে তাহারই সখী।

রাজপুত্র এবারেও শুক্তিপতির উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসিলেন কিন্তু এবারেও কোন উত্তর পাইলেন না।

ভোরের সময় আবার এক আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন—"দ্বারদেশে যে সন্ন্যাসী উপস্থিত, তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইয়া, তাঁহার পূজা অর্চ্চনা কর, তিনি প্রসন্ন হইয়া সকলকে পাপমুক্ত করিবেন।"

এই কথায় রাজপুত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রস্তুত পাইলেন। বাড়ীর দ্বারে এক অতি প্রাচীন সন্ন্যাসী মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে দাঁড়াইলেন—রাজপুত্র গললগ্নকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন—নিকটেই যে নদী বহিয়া যাইতেছে, সেই নদী হইতে জল আন। রাজপুত্র আজ্ঞামাত্র তাহাই করিলেন—সন্ন্যাসী সেই জল মন্ত্রপূত করিয়া পাষাণখণ্ডে দিবামাত্র পঙ্ককর্ম্মা নিজ দেহ প্রাপ্ত হইল, অজগর গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া রাজপুত্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, সন্ন্যাসী তাহার গাত্রে সেই জল ছড়াইয়া দিবামাত্র অজগর নিজ দেহ পাইল—সন্ন্যাসীর পদতলে আত্ম সমর্পণ করিয়া বলিল,—ঠাকুর, আপনার কৃপায় পাপমুক্ত হইলাম। পরহিংসা মহাপাপ, হিংসার তুল্য পাপ নাই, সংসারের লোক যেন মনে রাখে যে, পরহিংসায় মানুষ হিংস্র সর্পের দেহ পায়—আপনার মত গুরু কয়জন পায় যে,

ইতিমধ্যে সেই সরোবরের রাজকন্যা আপনার কাকাতুয়াটী বুকে করিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইল, সেই মন্ত্রপূত জল কাকাতুয়ার গায়ে দিবামাত্র পঞ্চকর্ম্মাও নিজ দেহ পাইল। তখন সকলে মিলিয়া রাজা প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদের সকলের বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়া প্রভুত জমি জায়গা জমিদারী দিলেন। সকলে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ভাবে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

যম ও নাই আঁকড়ে।

নাই আঁকড়ে কা'রে বলে, তোমরা বোধ হয় জান। নাই আঁকড়ে যে কথা বলে, সে কথার জেদ কিছুতেই ছাড়ে না— চোখে আঙুল দিয়ে তার ভুল দেখিয়ে দিলেও, সে আপনার কথা বজায় রাখ্‌তে ছাড়ে না।

শান্ত। নাই আঁকড়ে কথার জেদই ধরে, নামটা অমনতর হলো কেন?

পিসি মা—সেকথা শুন্‌বে? কলাই ভেঙ্গে ডাল তৈয়ারি কর্‌বার সময় দেখ না—যে কলাইগুলা জাঁতার নাইকে আঁকড়ে ধরে, যতই কেন জোরে জাঁতায় পাক দাও না, কিছুতেই ভাঙ্গে না; নাইয়ের গোড়ায় আটকাইয়া গোটাই থেকে যায়। মানুষও আপনার জেদকে এমনি আঁকড়ে ধরে যে, কিছুতেই সে জেদ ছাড়ে না, তাই সেই সকল মানুষকে নাই

আমাদের গ্রামে তেমনি একজন নাই-আঁকড়ে ছিল, সে যে কথার জেদ ধরতো, কিছুতেই ছাড়তো না। একদিন মাঠে একটা গোরু চরিতেছিল, নাই-আঁকড়ে একজন বন্ধুর সঙ্গে আসছিল। বন্ধু দূর থেকে নাই-আঁকড়ে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কল্লে, ভাই, গোরুটা গাই কি এঁড়ে বল দেখি?

নাই-আঁকড়ে বল্লে—ওটা গাই।

বন্ধু বল্লে,না। ওটা এঁড়ে। নাই আঁকড়ে কিছুতেই বন্ধুর কথা মানিল না, বল্লে,—"ওটা নিশ্চিতই গাই।

ক্রমে তারা গোরুটার কাছে এসে যখন দেখ্‌লে, গোরুটা সত্য সত্যই এঁড়ে, তখন নাই আঁকড়ে বল্লে—হোক্ এঁড়ে, কিন্তু গাই মুখো এঁড়ে।"

দেশ মধ্যে নাই আঁকড়ে ব'লে তা'কে সকলেই জান্‌তো। নাই আঁকড়ে জাতিতে ব্রাহ্মণ, তা'র এক বিধবা ভগ্নী ছিল—তা'র মৃত্যুকাল উপস্থিত, যমদূত এসে বিধবাকে যমালয়ে নিয়ে চল্লো। সেখানে পৌঁছিবামাত্র যমরাজ বল্লেন—এই মেয়েটা ব্রাহ্মণের বিধবা হ'য়ে একদিন মাছ খাবার ইচ্ছা ক'রেছিল, একে নরকে দাও।

ব্রাহ্মণ-কন্যা সেই নাই আঁকড়ে ব্রাহ্মণের ভগ্নী, একথা তোমাদিগকে আগেই বলেছি। সে যমরাজকে উত্তর কল্লে—

"আমার ভাই না বল্লে, আমি কিছুতেই নরকে যাব না, কার সাধ্য আমাকে নিয়ে যায়।

যমরাজ বেগতিক দেখে বল্লেন—তোমার মনের পাপের কথা তোমারই ভাই কেমন করে জানবে?

খাওয়ার ইচ্ছায়, পাপ হয় কি না, সে কথা আমার ভাই বল্লে, তবে সাব্যস্ত হবে।

শক্তের ভক্ত সকলেই,যম অগত্যা বাধ্য হয়ে নাই-আঁকড়েকে আন্‌তে পাঠালেন। দুজন যমদূত বাতাসের বেগে মর্ত্ত্যে এসে পৌঁছিল। নাই আঁকড়ে সেই মাত্র ভগ্নীকে দাহ করে এসে ঘুমুচ্ছিল। যমদূতেরা তাঁহাকে জাগাইয়া বলে, "ঠাকুর, তোমাকে একবার শিগ্‌গির যমালয়ে যেতে হবে, না গেলে তোমার ভগ্নীর বিচার হচ্চে না—যমরাজ আপনাকে নিতে পাঠিয়াছেন।

নাই আঁকড়ে বল্লে—ব্যাপারটা কি বল দেখি, আমিও তাই ভাবছিলাম, সে আমার ভগ্নী, যমালয়ে গিয়ে কি স্থির থাকবে—নিশ্চিতই একটা গোল বাধিয়ে বস্‌বে।

যমদূতেরা বল্লে—আপনার ভগ্নী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা হয়ে একদিন মাছ খাবার ইচ্ছে করেছিলেন, সেই পাপে কিছুদিন তা'কে নরক বাস কত্তে হবে। আপনার ভগ্নী বলেছেন, আমার ভাই এসে যদি বলে, এরূপ কর্ম্মে পাপ হয়, তা হ'লে দণ্ড লবেন, নতুবা লবেন না।

নাই আঁকড়ে বিছানা হ'তে উঠে, মুখ হাত ধুয়ে, একটু-জল খেয়ে, উড়ানীখানা কাঁধে ফেলে, যমদূতদের পশ্চাদ্গামী হলেন। পথে তিনি যমদূতদিগকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন, বৈধব্যাবস্থায় তাঁহার ভগ্নীর মনে একদিন গুগলী খাবার ইচ্ছা হয়েছিল, সেই পাপে ভগ্নীকে কিছুদিন নরক বাস করবার হুকুম হয়েছে ভগ্নী কিছুতেই সেই সাজা নিতে চান না। এই কথা শুনে নাই আঁকড়ে যমদূতদিগকে বল্লেন—দেখ, ঐ

দান কল্লেম, ঐ যে বড় বাড়ীটা দেখা যাচ্চে, আমি কোন-গৃহহীন সতীকে দিলাম; ঐ যে কালো কাকের চোখের মত জল পুকুর দেখচো, ওটাও আমি ব্রাহ্মণকে দিলাম। তোমরা সাক্ষী রইলে, আমি সদাচারী বামুনকে দিলাম।

এইরূপ কথায় বার্ত্তায় যমের বাড়ীর পথ পার হয়ে, নাই-আঁকড়ে ব্রাহ্মণ যমালয়ে উপস্থিত হইলে। যমরাজের সুন্দর বাড়ী, সোণার দেওয়ালে মণিমুক্তার কাজ করা, সোণার সিংহাসনে দিব্য সুন্দর মূর্ত্তি যমরাজ বসে সকলের বিচার কচ্চেন। নাই-আঁকড়ে বামুনের ভগ্নীও সেখানে উপস্থিত, ভাইকে দেখে সে কেঁদে অস্থির—কান্নার শব্দে যমরাজ তাহার দিকে চাহিলে নাই-আঁকড়ে যমকে জিজ্ঞাসিল, কি জন্যে আপনি আমাকে তলব করেছেন? নাই-আঁকড়ের ভাবভঙ্গি দেখে ন্যায়বান যমঠাকুর ভাবলেন, এ বিট্‌লে বামুনটার সঙ্গে বচসা করা বড়ই বিপদের কাজ, কি বল্‌তে কি বলে ফেলবে।

নাই আঁকড়েকে যম বল্লেন—তোমার সঙ্গে এখন আমার কোন দরকার নাই—তবে তোমার ভগ্নী বৈধব্যাবস্থায় এক-দিন গুগলী খেতে ইচ্ছা করেছিল, তার জন্যে তাঁকে কিয়দ্দিন নরক বাস করতে হবে। উনি কিছুতেই রাজি নহেন, তুমি বল্লে, তবে দণ্ডগ্রহণ করবেন। এখন উহাকে বুঝিয়ে বল—যমদণ্ড সকলকেই সহ্য কত্তে হয়, না হ'লে সংসার চলে না।

নাই। এই কথা? এর জন্যে আপনি আমার মত একজন মর্ত্ত্যের লোককে সশরীরে যমালয়ে আনলেন, কে আপনাকে যমগিরি দিলে? যাই হোক, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা

আসবার সময় যে যে পুণ্য কর্ম্ম করে এসেছি, সেগুলি কি আপনার খাতায় লেখা হয়েছে? কই খাতা দেখি?"

এই বলিয়া চিত্রগুপ্তের হাত থেকে খাতাখানা নিয়ে, নাই-আঁকড়ে দেখলেন, তাহার কোন উল্লেখই নাই। তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় যমকে বল্লেন—যদি একদিন গুগলী খাইবার ইচ্ছা হওয়ায় আমার ভগ্নীকে নরকে যেতে হয়, তা'হলে ব্রাহ্মণকে গোরু বাড়ী দানের জন্য কেন আমার স্বর্গবাস না লিখে রাখ্‌বে। যদি না লিখবে, তবে কিছুতেই ভগ্নী নরকে যাইবে না।

নাই-আঁকড়ের জেদ দেখে যম নিরস্ত হলেন, তা'র স্বর্গবাস লিখ্‌তেই হলো।

এজন্যেই লোকে বলে—নাই আকড়েকে যম আঁটতে পারেন না।

গরিব কবি।

আমাদের দেশের রাজা রাজড়ায় কবিদের খুব আদর কত্তেন, পুরস্কার দিতেন—যে যাহা রচনা ক'রে রাজাকে শুনাইত, রাজারা তাহাকেই অল্প বিস্তর কিছু না কিছু না দিয়া ক্ষান্ত হতেন না।

একদিন এক গরিব ব্রাহ্মণ রাজার কাছে উপস্থিত হ'য়ে একটুকরা কাগজ তাঁহার হাতে দিল। রাজা তখন বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন—ইহাতে কি আছে?

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল—একটী [illegible]।

রাজা দশটী টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন; ব্রাহ্মণ হাসিমুখে বিদায় লইল।

সমস্তদিন রাজকার্য্যের পর রাজা যখন অন্দরে শয়ন কত্তে যেতেন, তৎকালে যে কাগজ পত্র জামার জেবে থাকিত, সেই সময়ে দেখিতেন, পড়িতেন। অন্যান্য কাগজ পত্রের সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ কবির কবিতাটী ছিল, সেটী হা'তে উঠিল, রাজা সেটী পাঠ করিতে লাগিলেন—

প্রথমেতে খুড়ুশ খাড়ুস
চুপ করে বসে গেল্যা
উনকুটী মুনকুটী চাউনি
পথ ধরে চলে গেল পদো বেহারা।

পড়িয়া বালিশের নীচে রাখিয়া দিলেন—পরদিন প্রাতঃকালে রাজা রাজকাছারিতে বসিয়া বিচার আচার করিতেছেন, এমন সময় পদো বেহারা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া রাজার চরণতলে পড়ে বল্লে—

রাজা মশায়, আমার অপরাধ হয়েছে, মার্জ্জনা করুন।

রাজা। কেনরে পদো—কি করেছিস যে, তোকে ক্ষমা কত্তে হ'বে?

পদো। হুজুর, সবই জানেন, জেনেশুনেও কেন ছল কচ্চেন?

রাজা। জানিইতো, তবু তোর নিজ মুখে শুন্‌বো না—অমনি মার্জ্জনাটা ক'রে ফেলবো?

পদো। আজ্ঞা, কাল রাত্রে আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হলো—মনে কল্লেম, রাজা মশায়ের ঘরে সিঁধ দিলে অনেক টাকা

আপনার রাজবুদ্ধির কাছে কি আমাদের চোরবুদ্ধি খাটে ? আমি সিঁধ দিতে ব'সে একখানি ইট খুলেছি আর আপনি বল্লেন—প্রথমেতে খুড়ুস খাড়ুস।

একথা শোনাও যে, অমনি চুপ করে রইলাম। আপনিও বল্লেন—

চুপ করে বসে গেল্যা।

তখন আমি ভয়ে চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম—তা দেখে আপনি বল্লেন—

টনকুটি মনুকুটি চাউনি।

এই কথা শুনিবামাত্র আমি যেমন পলাইয়া যাইব, আপনি বল্লেন—পথ ধরে চলে গেল পদো বেহারা।

আপনার রাজ্যেতে চুরি ডাকাতি নাই বল্লেই হয়। আমার স্ত্রীকে সব বল্লাম—সে বল্লে, রাজা মশায় খুব দয়ালু—কেঁদে কেটে পায়ে পড়্‌লে মাপ কর্‌বেন, নতুবা সঙ্কট। রাজার সহর কোটাল আস্‌তে না আস্‌তে চলে গিয়ে রাজার পায়ে পড়। তাই রাজা মশায় আপনার কাছে এসেছি।

রাজা তখন সেই কবিকে ডাকিতে পাঠাইলেন—রাজবাড়ীর চোপদারকে দেখে কবি ব্রাহ্মণ ভেবেই অস্থির, তাঁকে কাঁপতে দেখে ব্রাহ্মণী বল্লেন—ঠাকুর, শুয়ে পড়, আমি এক[illegible] কাঁথা চাপা দিয়ে চোপদারকে বলি, তোমার জ্বর হয়েছে।

ব্রাহ্মণ বলিল—বোধ হয় কালকার কবিতাটায় কিছু দোষ হ'য়ে থাকবে।

ব্রাহ্মণী। টাকা কটা ফিরে দিলে হয় না ?

একটী হাড়ির ভিতর নেকড়ায় বাঁধা সেই দশটী টাকা ছিল। ব্রাহ্মণী চোপদারের হাতে দিয়ে বল্লে—

"কর্ত্তা বুড়ো হয়েছেন—দুঃখের জ্বালা সয্যি কত্তে না পেরে রাজার কাছে কি বল্‌তে কি বলেছেন। রাজা মশায়কে টাকা দশটী ফিরে দিয়ে মার্জ্জনা কত্তে বলো।"

চোপদার বল্লে—আমি সে কাজ কত্তে পারবো না, তাহ'লে আমার শির যাবে। ঠাকুরকে নিয়ে যেতেই হবে।

চোপদার যদি সে কথা বলিল, তবে আর উপায় কি—ব্রাহ্মণকে যাইতেই হইল। ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, রাজা তাহাকে হাজার টাকা বকসিস করিয়া বলিলেন—

"ঠাকুর, তুমি আমার অনেক টাকা বাঁচাইয়া দিয়াছ। তোমার যখনি এই টাকা ফুরাইবে, তখনি আসিয়া আমাকে জানাইলেই টাকা দিব।"

ব্রাহ্মণ টাকার মোট মাথায় করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে দেখিয়া, ব্রাহ্মণী আসিয়া মাথা হইতে টাকার মোট নামাইয়া বলিল—এ যে খুব ভারী দেখ্‌চি, কিসের মোট?

ব্রাহ্মণ বলিল—"টাকার।"

ব্রাহ্মণী আহ্লাদে আটখানা হইয়া জিজ্ঞাসিল——"উঃ, এত টাকা—কত লক্ষ হবে?"

ব্রাহ্মণ,—কি জানি, রাজা খাতাঞ্চীকে বলে দিলেন—ব্রাহ্মণকে হাজার টাকা দাও, হাজার টাকা কত তুমি জান না?

ব্রাহ্মণী। যতই হোক, আমাদের ছেলের ছেলেয় ফুরুতে

ব্রাহ্মণ। ফুরুলে রাজা আবার দিবেন বলেছেন।

ব্রাহ্মণী আরও খুসী, টাকা নিয়ে ঘটী ক'রে মাটীতে পুঁতে রেখে, খরচের মত ৩।৪ মুঠা বাহিরে রাখিয়া দিলেন।

সাত মামা--এক ভাগ্নে।

একটী দুঃখিনী স্ত্রীলোকের গোকুল নামে একটী পুত্র ছিল, দুঃখিনী একদিন তার ছেলেকে বল্লে যে, তুই লেখাপড়া করছিস্ নি, বড় হয়ে কি করে খাবি?" সে বলিল, মা, আমি একবারে যে রোজকার করবো, সেই রোজকারে ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং দিয়ে চিরকাল বসে খাব। তাতে তার মা বল্লে, একথা কখন শুনি না। একবার রোজকার করে কেউ কখন চিরদিন বসে খেতে পারে? ছেলে বল্লে, আমায় কিছু পয়সা দাও, কিছুদিনের জন্য বিদেশ যাই। তার মা তাহাকে কিছু পয়সা দিল, সে সেই পয়সা নিয়ে খানিক দূর গিয়া দেখিল, একটা ঘোড়া বনে চরে বেড়াচ্ছে। তখন সে ঘোড়াটাকে ধরলে, ধরে তাকে বাড়ী নিয়ে এল।

একদিন সে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছে, বেড়াতে বেড়াতে ঘোড়াটী এক রাজার রাজ্যে পৌছিল। যখন সন্ধ্যা হয়ে এল, তখন সে সেই রাজার বাড়ী অতিথি হ'লো। রাজা তাহাকে থাকিবার জন্য স্থান দিলেন। গোকুল ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে নিজে শুয়ে পরলো। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে

খেয়ে ফেলেছে। অতিথিকে তিরস্কার করিলে পাছে অতিথি রাগ করে, সেইজন্য তিনি কিছু বলিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে গোকুল ঘোড়াটীকে লইয়া বাড়ী ফিরিল—বাড়ী আসিয়া সে তার মাকে বলিল, মা, এই ঘোড়াটাকে বাজারে বেচে আসবো।

ঘোড়াটীকে বেঁধে রেখে সে নাইতে যাচ্ছে, এমন সময় দেখ্‌লে, তার সাত জন মামা আসিতেছে। তখন সে তাহার মামাদিগকে লইয়া বাড়ীতে আসিল এবং আদর যত্ন করে বসালো। গোকুল তার মামাদের সঙ্গে গল্প করছে, এমন সময় দেখ্‌লে ঘোড়াটী মলত্যাগ করিতেছে। তার মামারা দেখ্‌লে যে, ঘোড়ার মলের সঙ্গে টাকা পড়ছে? তার সাত মামা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, এই ঘোড়াকে যেমন করে হউক কিনিতে হবে।

কিন্তু ঘোড়ার মলে সত্য সত্যই টাকা হয় না। সে সেই রাজার টাকা খেয়ে ফেলেছিল, তাই তার মলের সঙ্গে টাকা বাহির হইল। তখন তার মামারা তাদের ভাগ্‌নাকে বল্লে, বাপু, এই ঘোড়া আমাদের দিতে হবে।" সে বল্লে, "মামা, এ ঘোড়াকে কি আমি দিতে পারি। এ ঘোড়াকে যদি আমি খাওয়াতে পারতুম, তাহলে কত বেশী টাকা পেতুম। এ ঘোড়া আমি দিতে পারবো না। তার মামারা বল্লে, "তোর তো টাকার দরকার, এই নে, তোকে দশ হাজার টাকা দিচ্ছি, তাহলে ঘোড়াটী দিবি?" গোকুল মনে মনে ভাব্‌লে যে, ঘোড়ার তো গুণ নয়। এই ভেবে সে তার মামাদিগকে ঘোড়া দিয়ে দশ হাজার টাকা নিল। তার মামারা ঘোড়া নিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

শুণ দেখছে। আর রোজকার কর্ত্তে না গেলেও চলে। সাত ভায়ে ঘোড়াকে খুব খাওয়াইল, খাইয়ে ঘোড়ার গুহ্যদ্বার পানে চাহিয়া রহিল, কখন ঘোড়া মলত্যাগ করে। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াটা অনেক মলত্যাগ করিল। সাত ভায়ে তাড়াতাড়ি মলটুকু যত্ন করে কুড়িয়ে ভাল করে ধুতে লাগ্‌লো। যত ধুতে থাকে, কিছুতেই আর টাকা পায় না, তখন সাত ভায়ে বল্লে—"ভাই, কই, টাকা ত বা'র হলোনা। ভায়েরা বল্লে যে, ভাল করে ধোনা। যত ধোয় তত তার হাত ক্ষয়ে যায়। তখন ভায়েরা বুঝিতে পারিল যে, ভাগনা তা'দিগকে ঠকিয়েছে। তাহাদের মনে অত্যন্ত দুঃখ হলো। তারা ভাগনেকে জব্দ করবার জন্য চিন্তা করতে লাগ্‌লো।

গোকুল একদিন বন হইতে দুইটী শৃগাল ধরিয়া আনিল এবং তার মাকে বলিল—

"মা, এই যে দুইটী শৃগাল আনিয়াছি, এ মামাদিগকে ঠকাইবার জন্য। তার মা বল্লে—বারবার ঠকালে ধরা পড়তে হ'বে। সে বল্লে—"না মা, এক কাজ কর। আমি একটী শৃগালকে বাড়ীতে বেঁধে রেখে যাবো, আর একটী সঙ্গে নিয়ে মামাদের কাছে যাবো। তোমাকে যে সকল খাবার তৈরি করতে বলবো, সেগুলি যেন ঠিক তৈরী থাকে।" তার মা বল্লে—"আচ্ছা।"

এই বলে গোকুল তার বাড়ীতে একটী শৃগালকে বাঁধিয়া অপরটী সঙ্গে লইয়া চলিল। খানিকদূর যাইতে যাইতে দেখিল, তার মামারা আস্‌ছে। তখন সে তার মামাদিগকে বল্লে—

বলে সেই শৃগালটীর কাণে বিড়্ বিড়্ করে কি যেন বল্লে, বলে তার মাথায় তিন চড় মেরে তা'কে ছেড়ে দিল। বনের শৃগাল বনে চলে গেল। তার মামারা বল্লে, ভাগ্না, শৃগালের কাণে কাণে কি বল্লে? গোকুল বল্লে, মামা, আপনারা এতখানি রাস্তা হেঁটে যাচ্ছেন, আপনাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতে শৃগালকে দিয়ে মাকে খবর দিলুম। তখন তার মামারা বলাবলি কল্লে যে, তবে ত বেশ সুবিধা হয়েছে, আমরা যখন ডাকাতি কর্‌তে যাই, তখন যদি কোন খবরের দরকার হয়, তবে শৃগালকে সংবাদের জন্য বাড়ী পাঠাইয়া দিলে সব ঠিক করা যায়। তারপর গোকুলের মামারা বাড়ী যাইয়া দেখিল যে, সত্য সত্যই ভাগনের বাড়ীতে শৃগাল বাঁধা রয়েছে, আর সমস্ত খাবার প্রস্তুত। গোকুল তার মামাদের যত্ন করে বসালো, পা-হাত ধোবার জল এনে দিল, তারপর ভাল করে তাহাদিগকে খাওয়াইল। মামাদের খাওয়া হলে পর তারা বল্লে—"ভাগ্নে, এই শৃগালের ত বড় গুণ দেখ্‌ছি। গোকুল বল্লে, হাঁ মামা, এই শৃগালের অনেক গুণ আছে।

তখন গোকুলের মামারা বলিল যে, বাপু, এই শৃগালটী আমাদিগকে দিতে হবে। সে বল্লে, মামা, আমি যথাসর্ব্বস্ব দিতে পারি কিন্তু এই শৃগাল দিতে পারি না। তা'র মামারা খুব জেদাজেদি করিতে লাগিল। তারা বল্লে, তোকে কিছু টাকা দিলে তুই দিতে পারবি না?" সে উত্তর কল্লে—মামা, তাতে আর কি এসে যায়। গোকুলের মামারা তাকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে শৃগালটী নিয়ে বাড়ী এল। বাড়ী

তাহারা কাজে বাহির হইল; কাজ আর কি—ডাকাতি। তারা ডাকাতি করিতে বাহির হইল। শৃগাল সঙ্গে লইয়া যাচ্ছে, এমন সময় তাহারা এক বৃক্ষের তলায় উপস্থিত হইল—তখন বড় ভাই বল্লে—"ভাই, বড় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা লেগেছে, এস, আমরা এই গাছের তলায় একটু বিশ্রাম করি। একটু বিশ্রাম কর্‌বার পর, এক ভাই অপর এক ভাইকে বল্লে—"দাদা, এই শৃগালকে বাড়ীতে খবর দিয়ে পাঠাও। তাহলে বাড়ীতে গিয়া খাবার প্রস্তুত পাবো, বিলম্ব কর্ত্তে হবে না। যাইবামাত্র সব ঠিক হয়ে থাকবে।" তাহাদের বড় ভাই শৃগালের কাণে কাণে বলিয়া মাথায় তিনটী চড় মারিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। এদিকে ভাইয়েরা বিশ্রাম করিতেছে, আর বলাবলি করিতেছে যে, শৃগাল এতক্ষণ বাড়ী গিয়ে বৌদিগকে খাবার কর্ত্তে বলেছে। শৃগাল ছাড়িবামাত্র বনের শৃগাল বনে চলিয়া গেল। তারপর সাত ভাইয়ে বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ী পৌঁছিয়া ভাবিল, শৃগাল আসিয়া এতক্ষণ খবর দিয়া গিয়াছে। তা'রপর সাত ভাইয়ে মুখ হাত ধুয়ে বৌদিগকে বল্লে—কই গো, খাবার দাও, তোমাদের বুঝি ভ্রূক্ষেপ নাই। বৌয়েরা বলিল, খাব্দের কোথায়, সবুর কর, তৈয়ার ক'রে দি—খাবার সময় ত বলে যাও নাই। বড় ভাই বল্লে—"সেকি! আমরা যে শিয়ালকে দিয়ে অনেকক্ষণ বলে পাঠিয়েছি, সেকি বলে যায় নাই? বড় বৌ বলিল—শিয়াল কি কখন কথা বল্‌তে পারে?"

তখন তা'রা [illegible] ব,তাদের ভাগ্‌না সকল দিকে তা'দিগকে ফাঁকি দিচ্ছে!

তখন তারা মনে মনে স্থির কল্লে, আজ তাকে মেরে ফেল্‌তে হবে। এই স্থির করে, সাতভায়ে বাড়ীর বাহির হইল। পথে যাইতেছে, এমন সময় তাহারা তাহাদের ভাগ্‌নার বাড়ীর কাছে কান্না শুন্‌তে পেলে। তখন সাতভায়ে বলাবলি করিল, এ কান্না গোল কিসের বল দেখি? তার মধ্যে এক ভাই বল্লে, এ যে ভাগনার কান্না শুন্‌ছি।

ভাগনা ভারি চালাক, তার মামারা আস্‌ছে শুনে, তার মাকে বল্লে, মা, কোন উপায়ে মামারা আমারে মেরে ফেল্‌তে-আস্‌ছে। তার মা বল্লে,—"কি করবো বাবা! উপায় ভেবে দেখ।"

তখন তার ছেলে বল্লে, মা, এক উপায় ঠিক করেছি। তুমি মড়ার মত হয়ে এই উঠানের উপর পড়িয়া থাক, আর আমি এই লাঠি গাছটা নিয়ে তোমার মাথার গোড়ায় বসে থাকি। যখন মামারা আস্‌বে, তখন আমি খুব কাঁদবো, আর এই লাঠিটা যখন তোমার গায়ে ঠেকাবো, তখন তুমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়্‌বে।

তার মা বল্লে, "আচ্ছা বাবা, এই উঠানের উপর শুইয়া পড়িলাম।" তখন গোকুল মাকে একখানি কাপড় চাপা দিয়ে, তার মাথার গোড়ায় বসে, কাঁদ্‌তে লাগলো। সেই কান্না তার মামারা শুন্‌তে পেয়ে, তার বাড়ীতে এলো, এসে বল্লে, কি হয়েছে বাবা গোকুল? সে বল্লে, মামা গো, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার মা মারা গেছে। এই বলে সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। তার মামারা বল্লে, আর কেঁদে কি হবে? গোকুল বল্লে, কেঁদে কিছু হবে না বটে, কিন্তু মামা, এই যে লাঠি [illegible] ছেন, এই

লাঠির এমন গুণ, মরা মানুষকে ঠেকাবামাত্র বেঁচে উঠে। তখন তার মামারা বল্লে, ভাগ্না, তবে আর বিলম্ব করছো কেন? তারপর তাদের ভাগ্না সেই লাঠিটী তার মার গায়ে ঠেকাইবামাত্র তার মা উঠিয়া বসিল। তখন গোকুলের মামারা বুঝিল, সত্য সত্যই লাঠির গুণে ভগ্নী বাঁচিল।

গোকুলের নির্ব্বোধ মামারা যুক্তি কর্‌লে, যেমন করে হ'ক্ লাঠিটী নিতে হবে। মামারা বল্লে, "ভাগ্না, এই লাঠিটী আমাদিগকে দিতে হবে।"

ভাগ্না বল্লে, মামা, আমি সর্ব্বত্যাগী হতে পারি কিন্তু এই লাঠিগাছটী দিতে পারি না।

তা'র মামারা বল্লে, "তোর ত টাকার দরকার, এইনে ১০ হাজার টাকা, লাঠিটী আমাদিগকে দে। ভাগ্না মামাদের অনেক অনুরোধে লাঠিটী দিল। তারপর তার মামারা বাড়ী রওনা হলো।

পথে আসিতে আসিতে সাত ভায়ে যুক্তি করিতে লাগিল। একজন বলিল, ভাই, এবার যখন আমরা ডাকাতি করতে যাবো, তখন বৌদের সকলকে মেরে রেখে যাব। যখন তারা সকল ভায়ে ডাকাতি কর্‌তে গেল, তখন তারা আপনাপন বৌদিগকে মেরে বাড়ীর বাহির হলো। তারপর তারা ডাকাতি করে বাড়ী ফিরিলে, বৌদের গায়ে লাঠি ঠেকাইল, কেহই বাঁচিল না। তখন সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিল,—"দাদা, কই, কেহই ত বাঁচিল না— ভাঁগনা বড় ঠকাইল।

যাহা হউক, সকলে মিলে যুক্তি কল্লে, যেমন করে হোক

পরদিন সকাল বেলা সাত ভাগ্নে বলাবলি কর্‌ছে, চল ভাই, এইবার ভাগ্‌না বেটাকে ধরে নদীর জলে ফেলে দিই গে। যতই কাঁদুক, কিছুতেই ছাড়বো না। তারপর ভাগ্‌নার বাড়ীতে গিয়া দেখে, ভাগ্‌না বাড়ীতে রহিয়াছে, তখন তারা কিছু না বলে, ভাগ্‌নাকে সাত মামায় এক খণ্ডের ভিতর পুঁরিয়া মুখটী বাহির করিয়া চারিদিকে বাঁধিল, বাঁধিয়া নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে বল্লে, চল, আমরা এখন একটু বেড়িয়ে আসি। ভাগ্‌না বেটা রৌদ্রে পড়িয়া চিংড়িপোড়া হ'ক। এই বলে সাত মামা তা'কে নদীর ধারে ফেলে বেড়াতে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখ্‌লে যে, একজন শিখ ঘোড়ায় চড়ে নদীর ধার দিয়ে আস্‌ছে। তখন শিখ তাকে দেখে বল্লে, "ভাই, তুমি এরূপ অবস্থায় এখানে এ রকম ভাবে পড়িয়া আছ কেন?" সে বল্লে, ভাই, দুঃখের কথা কও কেন, এই নদীর জলের ভিতর এক রাজকন্যা আছে। আমার মামারা তাহার সহিত বিবাহ দিবার জন্য জেদাজেদি কর্‌চে, কিন্তু আমি বিবাহ কর্‌তে চাই না। সেইজন্য তাঁরা আমাকে বেঁধে এইখানে ফেলে রেখে কি জন্যে কোথায় গিয়াছেন জানি না—তা'রা এসে আমাকে জলে ফেলে দেবে, তাহলে আমার সহিত রাজকন্যার বিবাহ হবে। তখন শিখ বল্লে, যদি তোমার রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে আমি কি রাজকন্যাকে বিবাহ কর্‌তে পারি না?

গোকুল বল্লে, কেন পার্‌বে না। তুমি তোমার সমস্ত পোষাক খুলে ফেল, ঘোড়াটাকে নদীর ধারে রাখ, আর আমি তোমায় আমার মত বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখি। তারপর যখন মামারা

আস্‌বেন, তখন তোমাকেই নদীর জলে ফেলে দেবে, তাহলেই তোমার সহিত রাজকন্যার বিবাহ হবে। শিখ তার কথা মত কাজ করিল। তারপর গোকুল তাহাকে খুব ভাল করে বেঁধে, নদীর ধারে ফেলে রেখে, নিজে শিখের পোষাক পরিল। পরে ঘোড়ায় পিঠে চড়ে বল্লে, দেখা যাক, মামারা কি করে! এই ব'লে সে একটা বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে রইল। খানিক ক্ষণ পরে তার মামারা এসে তাড়াতাড়ি তাকে নদীর জলে ফেলে দিয়ে বলাবলি কর্‌তে লাগলো—ভাগ্‌না বেটাকে মেরে এখন বাঁচ্‌লাম। তারপর তার মামারা যখন বাড়ীর দিকে যায়, তখন ভাগ্‌না মামাদের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখ্‌বামাত্র তার মামারা চমকিয়া উঠিল, বলিল, তোকে যে এই মাত্র নদীর জলে ফেলে দিলুম, তুই এই পোষাক আর ঘোড়া পেলি কোথা? সে বল্লে, মামা, আপনারা আমাকে নদীর কিনারায় ফেলে ছিলেন বলে, এই ঘোড়া আর পোষাক পেয়েছি; যদি মাঝ-খানে ফেলতেন, তা হলে হাতী ঘোড়া আর কত মণি মুক্তা পেতাম!

তার মামারা বল্লে, ভাগ্‌নে, তবে আমাদের একে একে সাত জনকে জলে ফেল দে, তাহলে আমরা সাতটী ঘোড়া ও কত মণি মুক্তা পাব।

ভাগ্‌না বল্লে, আপনাদের সিন্দুকের কাটীটী আমাকে দিন, তারপর আপনারা হাতী নিয়ে এলে আমি কাটী ফিরিয়ে দিব।

মামারা হাতীর লোভে তা'কে কাটীটী দিল। তার পর সে সাত মামাকে বেঁধে একে একে জলে ফেলে দিল, দিয়ে ভাবলে, "এইবার ত আমার সব,—এই বলে সে মামার

বাড়ীর টাকা কড়ি, জিনিস পত্র সমস্ত নিজ বাড়ীতে নিয়ে এসে মাকে বল্লে, "মা, দেখ্‌লে, আমি যে বলেছিলাম, একবার রোজকার করে চিরকাল খাব, তা সত্য কি না দেখ। তখন তার মা বল্লে, তোমার রোজগারকে ধন্য, আর তোমাকে ধন্য!

রাজা ও রাজপুত্র।

সেকালের রাজাদের অনেক রাণী থাকিত, দুচারটার তো কথাই নাই, কেহ কেহ দশ একশও বিবাহ করিতেন। রাজাদের কথাতেই বিবাহ। মন্ত্র তন্ত্র বলিতে হইত না—কেবল যাঁহারা পাটরাণী, তাঁহারাই রাজার বিবাহিতা, এমন রাণী দুই চারিটীর বেশী থাকিত না। এই রকম এক রাজার দুটী রাণী—দো আর সো। দোরাণীর চারিটী পুত্র আর সোরাণীর ছেলে মেয়ে কিছুই ছিল না। কিন্তু ছোট রাণীকে খুব দেখ্‌তে সুন্দর বলে, রাজা তাঁহাকেই বেশী ভালবাসিতেন। রাজার চারিটী ছেলেরই বিবাহ হইয়াছিল। চারি বধূ। একদিন ছোট বধূ তাঁহার স্বামীকে বলিলেন,—আজি রাত্রে রাজা বাহাদুরকে সর্পাঘাত হইবে।

ছোট রাজপুত্র বলিলেন—উপায় কি?

ছোট বধূ। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাহারা দাও, সাপ ঘর ঢুক্‌তে না পারে, বাহিরেই কেটে ফেল্‌বে।

রাজপুত্র তাহাই করিলেন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রাজার

ভয়ানক বিষধর সর্প যেমন রাজার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে, অমনি রাজপুত্র খড়্গাঘাতে সাপকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন, সেই খণ্ডগুলি একটী পেঁটরা মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া, আপনার ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন।

শেষ রাত্রিতে সোরাণী ঘর হ'তে বাহির হ'বামাত্র সাপের রক্তে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান, এবং সর্ব্বাঙ্গে রক্ত লাগিয়া যায়।

রাণীর পাদস্খলন শব্দে রাজা উঠিয়া বাহিরে আসিলেন—দেখিলেন, রাণীর সর্ব্বাঙ্গ শোণিতাক্ত। জিজ্ঞাসায় রাণী বলিলেন,—"কি হ'তে কি হ'লো জানি না। তোমার ছোট ছেলে দিব্যেন্দ্র ছুটে গেল দেখ্‌লাম। সেই কিছু করে গিয়েছে!

শুনিয়া রাজার বড় রাগ হইল—পুত্র হইয়া বিমাতার গৃহে, পিতা থাকিবার কালে, উঁকি-ঝুঁকিমারা বড়ই ঘৃণা লজ্জার কাজ। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে প্রাতঃকৃত সারিয়া রাজা রাজসভায় বসিলেন—সর্ব্বাগ্রে কনিষ্ঠ পুত্রের অপরাধের বিচার হইবে—সকলেই উদ্‌গ্রীব। সে কালের রাজাদের হঠাৎ শিরশ্ছেদ হুকুম, যেন তাহার নীচে অপর কোন দণ্ডই ছিল না। কনিষ্ঠ রাজপুত্র আপনার জীবন আর বেশীক্ষণ স্থায়ী নয় জানিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

রাজা বুড়া হইয়াছিলেন বলিয়া, বিচার আচার করিবার সময় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কাছে বসাইয়া রাজকার্য্য শিখাইতেন। সেদিনও জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র বিচারসভায় বসিলেন। রাজা আপনিই

প্রাণ নষ্ট করা হইবে, তাহাই স্থির করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র এই উপলক্ষে রাজাকে একটী গল্প শুনাইতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন—হঠাৎ কোন কাজ করা কর্ত্তব্য নহে, করিলে পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হয়।

"এক রাজার এক বিশ্বস্ত চাকর ছিল, তাহার একটী পোষা কুকুর ছিল। কুকুরটীকে সে বড় ভালবাসিত। একদা চাকরের কিছু টাকার দরকার হয়। এক মহাজনের কাছে সে হাজার টাকা ঋণ করে। মহাজন টাকার জন্য তাহাকে বিব্রত করে। রাজ-দরবারে নালিশ করিলে তাহার চাকরী থাকিবে না। চাকর কি করে, রাজার কাছে হাজার টাকা ঋণ চাহে। তাহারে জামিন স্বরূপ আপনার সেই পোষা কুকুরটীকে রাখিয়া দিল। রাজা জানিতেন, কুকুরটী তাহার বড়ই প্রিয়; সে প্রাণ দিতে পারে. তবু কুকুরটীকে ছাড়িতে পারে না। রাজা কুকুর রাখিয়া চাকরকে হাজার টাকা ধার দিলেন। রাজভৃত্য কুকুরকে বলিল,—যাবৎ সে রাজ ঋণ শোধ করিতে না পারে, তাবৎ সে অন্যত্র কাজ কর্ম্ম, ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা হাজার টাকা জমাইতে পারে, এমন্ কাজ করিতে যাইবে। হাজার টাকা জমিলে, সে তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া আসিবে। এখন হইতে রাজাই তোমার প্রভু হইলেন। আমাকে যেমন সেবা করিতে, রাজাকেও সেইরূপ করিবে।

এই বলিয়া রাজভৃত্য কুকুর রাখিয়া রাজবাড়ী হইতে বিদায় লইল।

একদিন রাত্রিকালে রাজবাড়ীতে ডাকাত পড়িল। ডাকাতেরা

লইয়া গেল। রাজা সহরকোটালকে ডাকিয়া মহা জুলুম আরম্ভ করিলেন। সমস্ত চুরি যাওয়া জিনিষ উদ্ধার করিয়া দিতে না পারিলে, সহরকোটালের চাকরি থাকিবে না, বেশীর ভাগ তাহার জরু গোরু ধান ধন যাহা কিছু আছে সমস্তই বাজেয়াপ্ত হইবে।

রাজা সহরকোটালকে যতই তম্বি করেন, সেই কুকুরটী ততই রাজার পায়ে পড়ে, পায়ে ধরিয়া টানে, আর কাতর শব্দে ডাকিতে থাকে।

রাজা কুকুরকে পুনঃ পুনঃ কাকুতি মিনতি করিতে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—পাত্র মিত্রও সকলে চলিল। কুকুর তাঁহাদিগকে ক্রমে ডাকাতদের বাড়ীতে লইয়া হাজির করিল। তাহাদের বাড়ী তল্লাস করিতে সমস্ত চোরা মাল পাওয়া গেল। রাজা কুকুরের প্রতি বড়ই তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—তুই আমাকে চাস, কি তোর মনিবকে চাস?

কুকুর ইঙ্গিতে জানাইল—মনিবকে চাই। রাজা একখানি চিরকুটে লিখিয়া দিলেন, হাজার টাকার দায়ে ইহার মনিবকে অব্যাহৃতি দিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সেই হুকুম-নামার কাগজটুকু কুকুরের গলায় বাঁধিয়া,তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

কুকুর ছুটিয়া আপনার মনিবের অনুসন্ধানে চলিল। দুই তিন দিন ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার প্রভু তাহাকে দেখিতে পাইয়া, ভাবিল, কুকুর বেইমানি করিয়া রাজার নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। রাগে অন্ধ হইয়া সে কুকুরের মাথায় এক লাঠি মারিয়া বসিল, তাহাতেই কুকুরটী প্রাণত্যাগ করিল। পরে

চুরি যাওয়া জিনিষের উদ্ধার করিয়া দেওয়ায়, তাহার প্রার্থনা মতে রাজা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তখন রাজভৃত্য শোকে অভিভূত হইয়া আত্মহত্যা করিল। সে সেদিন হাজার টাকা লইয়া রাজার ঋণ শোধ করিবার জন্য যাইতেছিল; পথে কুকুরকে দেখিয়া ভুলক্রমে তাহার প্রাণদণ্ড করায়, অনুতাপে তাহাকে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল।"

রাজার চারি পুত্রই রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। মধ্যম পুত্র বলিলেন—"এক রাজপুত্র একটী শিকারে পাখী নিয়ে বনে শীকার কত্তে গিয়েছিলেন। বেলা অনেক হইয়াছিল। রাজপুত্র ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, ঝরণা দিয়া এক এক ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে;— তৃষ্ণার জ্বালায় তিনি অঞ্জলি পাতিয়া সেই ফোঁটা ফোঁটা জল ধরিয়া যখন অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া পান করিতে উদ্যত হইলেন, তাঁহার শীকারী পাখীটা ডানার ঝট্‌কান দিয়া সেই জল ফেলিয়া দিল। রাজপুত্রের রাগের সীমা নাই, শিকারীকে পাথরের উপর আছাড়িয়া মারিয়া ফেলিলেন। শিকারী পড়িয়া রহিল, রাজপুত্র তখন ভাবিলেন, ঝরণা নিকটেই, এই বলিয়া পাহাড়ের গায়ে একটু উঠিয়া দেখিলেন—ঝরণার মুখের উপর এক বৃহৎ বিষধর সর্প পড়িয়া থাকায়—ঝরণার গতি রোধ করিয়াছে। তখন শিকারীর জন্য রাজপুত্রের মনে বড়ই দুঃখ হইল, অঞ্জলির জল পান করিলে আর তাঁহাকে বাঁচিতে হইত না, বিষভোজনে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইত।

হঠাৎ কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার দোষ অনেক। ভালরূপে

তৃতীয় পুত্রটীও একটী গল্প বলিলেন,—"এক সওদাগর রাজাজ্ঞা পাইয়া দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যের জিনিষ-পত্র আনিতে যান। তৎকালে সদাগর-পত্নী নয় মাস অন্তঃস্বত্বা ছিলেন, বাণিজ্য করিয়া ফিরিয়া আসিতে তাঁহার সতের আঠার বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া তিনি আপনার আগমন-বার্ত্তা কাহাকেও না জানাইয়া, অতি প্রত্যুষে হঠাৎ বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং আপনার শয়ন-গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী এক যুবকের সহিত একশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। বহুদিন অনুপস্থিত থাকায়, পত্নীর চরিত্র পরীক্ষার জন্যই তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি আপনার তরবারি দ্বারা যুবকের মস্তক দেহ হইতে পৃথক করিবামাত্র তাঁহার পত্নীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, স্বামীকে খড়্গ-হস্ত এবং আপন পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়া বলিলেন,—সর্ব্বনাশ করিলে, আমার সোণার চাঁদ পুত্রের প্রাণ নষ্ট করিলে?

সদাগর তখন দেওয়ালের গায়ে একখণ্ড কাগজে লেখা আছে দেখিলেন—হঠাৎ কোন দুঃসাহসিক কাজ করিও না। দেখিবামাত্র তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, মনে করিতে লাগিলেন,—কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। তখন আর অনুতাপে ফল কি—অতএব হঠাৎ কোন কাজ করা ভাল নহে, এইটী মনে ভাবিয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণদণ্ডে একটু বিলম্ব করুন।"

টিয়াপাখী ছিল। রাজার পাখী রাজসভায় দাঁড়ে ঝুলান থাকে, বিচার আচার শোনে, এজন্য যেখানে যত টিয়াপাখী আছে, রাজ-টিয়াকে তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর্‌বার জন্যে যেতে হয়। টিয়া একবার পাখিদের বিবাদ মিটাইতে গিয়া, রাজার জন্য একটী ফল আনিল। ফলটী যে খাইবে, সে যদি বৃদ্ধ হয়, তবে যুবা হইবে, আর যদি যুবা হয়, চিরজীবন যুবাই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু মাটীতে পড়িলেই সেফল বিষের কাজ করিবে, যে খাইবে, সেই মরিবে। এ ফলের নাম অমৃত ফল। রাজা সেই ফল পাইয়া বাগানের মালীকে দিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, ফলটী বাগানে পুঁতিয়া গাছ করিবে, তা' হ'লে আমার রাজ্যের অনেক লোক তাই খেয়ে অমর হবে। যখন গাছে ফল হয়ে পাক্‌বে, তখন পেড়ে আন্‌বে, সাবধান, যেন মাটীতে না পড়ে—শূন্যে আনিবে।

মালী তাহাই করিল। গাছ হইল, গাছে ফলও ধরিল, কিন্তু ফলটী যখন পাকিল, মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল, মালীর মনে ছিল না যে, শূন্যে পাড়িয়া লইয়া যাইতে হইবে। রাজার ভয়ে মালী ফলটী ধুইয়া রাজার কাছে আনিল। রাজা ভাবিলেন, পাখী ত অমৃত ফল বলিয়া আনিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত গুণ জানা যায় নাই। গাছে আরও তো অনেক ফল হয়েছে, এটা একটা কুকুরকে খাওয়াইয়া দেখা যা'ক। কুকুর সেই ফল খাইবামাত্র ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিয়া গেল। দেখিয়া রাজা পাখীটাকে আছাড়িয়া মারিয়া ফেলি-লেন। অতঃপর সে ফলকে বিষফল বলিয়া সকলে

হয়। বুড়ী রাগে রাজার বাগান হইতে সেই ফল পাড়িয়া খাইয়া ফেলিল। ফল মাটী স্পর্শ করিল না, বৃদ্ধা খাইবামাত্র যুবতী হইয়া ঘরে ফিরিল। সে কথা মুখে মুখে রাজার কাণে উঠিল। রাজা তখন আর একটী ফল আপনি পাড়িয়া খাইবামাত্র নবযৌবন পাইলেন। তখন তিনি সেই রাজটিয়ার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।"

এই কথায় রাজা কনিষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার কিছু বলিবার থাকে বল, তোমাকে আমি মার্জ্জনা করিব।

কনিষ্ঠ পুত্র আদ্যোপান্ত সকল কথাই জানাইল, পেঁটরা হইতে খণ্ড খণ্ড করা সর্পদেহ দেখাইল। রাজা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ছোট রাণীকে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুতিয়া ফেলিবার আজ্ঞা দিলেন। পুত্রেরা, রাজাজ্ঞা মত কার্য্য করা হইয়াছে, রাজাকে শুনাইয়া, ছোট মাতাকে বনে পাঠাইয়া দিলেন।

দানের ফল।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্র ভিক্ষার দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, সংসারে তাহার মাতা বই আর কেহ ছিল না। মাতা পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, পুত্র কিছুতেই রাজি হয় নাই—মা যখনই বিবাহের কথা তুলিতেন, তখনই পুত্র বলিত, "মা, যতদিন তুমি আছ, ততদিনই আমি

সংসারে আছি, তুমি স্বর্গারোহণ করিলে বনে গিয়া তপস্যা করিব। পুত্র পুনঃপুন ইহাই বলে, কোনদিন ভুলেও এমন একটী কথা বলে নাই যে, তাহাতে তাহার সংসারী হইবার ইচ্ছা বুঝিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ-পুত্র প্রতিদিন ভিক্ষা করিয়া যাহা পায়, তাহাতে তাহাদের দুইজনের ভরপুর হইয়াও অনেক বাঁচে। একদিন ব্রাহ্মণ-পুত্রের শরীর অসুস্থ, ভিক্ষায় যাইতে পারে নাই, মা'কে জানাইল, "মা, আজি ভিক্ষায় যাইতে পারিব না।"

মা বলিলেন,—তা' হ'লে আজ কেমন করে চল্‌বে বাবা?

ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যভাবে মাকে জিজ্ঞাসিল, আমি যে রোজ ভিক্ষা করিয়া আনি, সবই কি আমরা দুজনে খাইয়া ফেলি?

মাতা বলিলেন,—না বাবা, অনেক বাঁচে, আমি গরিব দুঃখীকে বিলাইয়া দিই।

পুত্র। একদিনও চল্‌বার উপায় রাখ না?

মাতা। না বাবা, ভগবান যেমন দেন, তেমনি চলে।

পুত্র। মা, এমন ক'রে যে আপনি দান করেন, তা'র কি ফল হয় মা?

মা। আমার গুরুঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে বল্‌বো।

মাতা গুরুঠাকুরের আজ্ঞা ও উপদেশ মত কিছু সঞ্চয় না রাখিয়াই সব ফুরাইয়া দিতেন। এ রকমে দান করাও তো ভাল নয়—এই মনে করে গুরুকে জিজ্ঞাসায়, তিনি বলিলেন, তোমার পুত্রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে। ব্রাহ্মণ-কন্যা তাহাই করিলেন। পুত্রের নাম হরিচরণ। সে কুলগুরুর

করিলেন, তুমি ঐ যে পাহাড় দেখা যা'চ্চে, তার এক মুনি থাকেন, তাঁকে জিজ্ঞাসিলে উত্তর পাইবে।

ব্রাহ্মণ হরিচরণ সেই পর্ব্বতে উঠিয়া দেখিল, মুনি ঠাকুর ধ্যানে আছেন, তাহার পদ সঞ্চারেই হউক বা যোগবলেই হউক, তাহার আগমন বুঝিয়া চক্ষু মেলিয়া হরির দিকে চাহিলেন। হরি জিজ্ঞাসিল—"ঠাকুর, দানের ফল কি?"

তিনি বলিলেন—ভগবান ব্রহ্মা ঐ যে নীল পাহাড়টা দেখচো, ঐখানে থাকেন, সেখানে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসিলে তিনি বলিয়া দিবেন। হরিচরণ বিলম্ব না করিয়া নীল পাহাড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ব্রহ্মা চারি মুখে বারটী চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যানস্থ। তিনি চক্ষু চাহিয়া হরিচরণকে দেখিয়া বলিলেন—হিমালয় পর্ব্বতে ভগবান বিষ্ণু আজি দিন কতক হইল বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিয়াছেন, সেখানে যাইলেই, তাঁহা[illegible] জিজ্ঞাসিতে হইবে না, তিনি সর্ব্বান্তর্যামী, বলিয়া দিবেন।

হরি তাহাই করিল—ভগবান বিষ্ণুর নিকট যাইবার জন্ম কত পাহাড় পর্ব্বত পার হ'তে হলো—কত ঋষি তপস্বীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হ'লো, যাঁহারা ধ্যানস্থ, তাঁহাদের সঙ্গে কোন কথা হইল না, দুই একজন করিয়া পাঁচটী যতির সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহারা সবে মাত্র যোগাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা মাত্র তাঁহারা সকলেই একে একে বলিলেন,—"আমরা ফল মূল খেয়ে যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়াও সে হরির সন্ধান পাই নাই, তুমি কেমন ক'রে তাঁর সাক্ষাৎ পেতে চাও, বলতে পারি না। যাও, যখন ব্রহ্মা বলে দিয়েছেন,

এই কথা শুনিয়া হরি একমনে, একধ্যানে ভাগবানকে ভাবতে ভাবতে চলিল, এক মাসের পর হিমালয় পর্ব্বতের গায়ে যেখান হ'তে গঙ্গা কুলকুলশব্দে গোমুখীর পথে ছুটিতেছেন, সেইখানে গিয়া এক হীরা মণি মাণিকের কাজ করা সোণার অট্টালিকার মধ্যে গিয়া, হরি দেখিল—সনক সনাতনাদি ঋষি তথায় উপস্থিত, স্বর্ণ সিংহাসনে ভগবান নন্দনন্দন গোলোকের হরি লক্ষ্মীর সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা কহিতেছেন। হরি সেই যুগল মূর্ত্তি চর্ম্মচক্ষে দেখিয়া জন্ম সার্থক জ্ঞান করিল, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে ভগবান বলিলেন—"হরি; বাড়ী যাও, কেন এত কষ্ট স্বীকার ক'রে এখানে এসেছ? ঘরে বসে একমনে ভাবলেই, ত সব জানতে পারতে, বাড়ী যাও, সেখানে গিয়াই দানের ফল দেখতে পাবে।"

"ভগবান, এখানে না এলে আমার চর্ম্মচক্ষে দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত শ্রীপাদপদ্মযুগল এবং মা কমলারই বা কেমন করিয়া দর্শন পেতাম। হরিচরণ সার্থক হইল, বাড়ী ফিরিয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে সে দেখিল, যেন সে যমপুরে গিয়াছে—সেখানে দেখিল, কত পাপী পাপের যাতনা ভোগ করিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ যাতনায় ছটফট করিতেছে। এক কৃপণ ব্রাহ্মণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া অন্নজল চাহিতেছে। যমদূতেরা বলিতেছে, দিয়া আসিস্ নাই, কোথা থেকে পাবি। একটা ঘরে সুমিষ্ট নানাবিধ খাদ্য পানীয় বস্ত্র সমস্ত স্তূপাকারে রহিয়াছে, ব্রাহ্মণ সেই সকল দেখাইয়া বলিল—ঐ যে অত খাবার, অত

যমদূত বলিল "ও কার খাবার জানিস্? বিলাস গাঁয়ের কমলা বামনীর—সে ছেলের মুখে রক্ত উঠা ধন গরিব দুঃখীকে দিচ্চে, সে এখানে এসে খেতে কিলুতে পাবে, তুই কেমন করে এ সব খেতে পাবি।

হরির বাড়ী বিলাস গাঁয়ে, তার মার নাম কমলা। হরি মায়ের দানের ফল দেখে অবাক হ'য়ে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসিল, "যে ছেলের উপায়ে কমলা ঠাক-রুণ দানধ্যান কচ্চে, সেই ছেলের কিছু নাই?"

যমদূত বলিল—সে উপার্জ্জনই কচ্চে, উপার্জ্জন করে মাতৃসেবা করচে, তার ফল আলাহিদা, সে ফল পাবে বই কি, কিন্তু দানের ফলতো পাবে না।

তাহার পার্শ্বেই কতকগুলি শূকরকে দেখতে পেয়ে হরি জিজ্ঞাসিল—"এরা সব কারা?"

যমদূত বলিল—দাতায় দান করে, কিন্তু যাঁরা তায় বাধা দেয়, ইহারা তাহারা। এরা এখানে এসে বিষ্ঠা ভোজন কত্তে কত্তে কৃমি হইয়া যায়। আবার যদি কোন পুণ্যের ফল থাকে, তবে মনুষ্যজন্ম পায়, নতুবা আবার আশি লক্ষ জন্ম ঘুরিয়া মনুষ্যদেহ ধরিতে পায়।

ভোর হইল, হরির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—বিছানা থেকে উঠে মাকে সব কথা বলিল, তারপর আপনিও দান ধ্যান কত্তে আরম্ভ করিল।

প্রেম ও প্রতিহিংসা।

সমুদ্র-পারে যবদ্বীপ নামে একটা দ্বীপ আছে। বহুকাল হলো সেখানে একজন রাজা ছিলনে, তাঁ'র নাম ধীরেন্দ্রসিংহ। সেকালে তাঁ'র মত রাজা কোথাও ছিল না, এই রকম কথাই সকলে বল্‌তো। যখন ধীরেন্দ্র সিংহ যুবা ছিলেন, সেই সময়ে তিনি একদিন ঘোড়ায় চ'ড়ে আপনার রাজ্যের চারিদিক দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন; এমন সময় একটী কুটীর মধ্যে এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া, ঘোড়া হইতে নামিলেন। নামিয়া সেই স্ত্রীলোকের পরিচয় লইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন থাকিতে থাকিতে সেই কন্যা গর্ভবতী হইলেন। দশ মাস দশ দিনে একটী অতি সুন্দর পুত্র জন্মিল। পুত্রটীর অন্নপ্রাশন দিয়া রাজা আপনার রাজধানী যাত্রাকালে আপনার হাতের সুতীক্ষ্ণ তলোয়ারখানি এবং আপনার পাদুকা জোড়াটী একটী গর্ত্ত মধ্যে পুঁতিয়া তাহার উপর একখানি পাথর চাপা দিয়া বলিলেন—"এই তলোয়ারখানি আমি এক দেবতার নিকট পাইয়াছি, ইহা হাতে থাকিলে মনুষ্য পশুপক্ষী রাক্ষস ভূত প্রেত কিছুই করিতে পারিবে না। পুত্রের নাম রহিল হেমেন্দ্র সিংহ। হেমেন্দ্র যখন বড় হইয়া পাথরখানি তুলিতে পারিবে, তখন এই জুতা জোড়াটী পায়ে দিয়া তলোয়ারখানি হাতে লইয়া আমার রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, আমি ইহাকে আমার সিংহাসনে বসাইব।" এই

ঠিক এই সময়ে বোর্ণিও নামে যে একটী দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপের রাজা প্রতাপাদিত্যের একটী পুত্র জন্মিল, তাহার নাম উদয়াদিত্য। রাজা প্রতাপ অতি যত্নের সহিত আপন পুত্রের লালন-পালন করতঃ তাহাকে নানা বিদ্যায় পারদর্শী করিলেন। উদয় অস্ত্রবিদ্যায় কৃতবিদ্য হইল। যে যে গুণ থাকিলে রাজাদের সুখ্যাতি হয়, উদয় সে সমস্তের অধিকার পাইল।

যবদ্বীপে প্রতি বৎসর একটী করিয়া মেলা মহোৎসব হইত, তা'তে নিকটের যত দ্বীপ, যত রাজ্য ছিল, সকল জায়গা হ'তে রাজপুত্রেরা আসিতেন, তাঁহাদের অস্ত্র ও বাহুযুদ্ধের পরীক্ষা হইত। বর্ণিওর রাজপুত্র উদয় বড় হইলে রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে এই মহোৎসবে যাইবার অনুমতি দিলেন। যবদ্বীপের বড়লোক মাত্রেই উদয়ের কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি যে সকল গুণে গুণবান্, তাহা কাহার অবিদিত ছিল না। কেবল ধীরেন্দ্র সিংহ হিংসাদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার গুণের কথা উপেক্ষায় উড়াইয়া দিতেন। রাজপুত্র উদয় যাত্রার আসিয়া উপস্থিত হইলে, ধীরেন্দ্র সিংহ তাহার প্রাণনাশের আয়োজন করিলেন, কিন্তু পাছে প্রজারা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অশ্রদ্ধা অভক্তি করে, তজ্জন্য তিনি গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন। একথা সাধারণে বড় জানিতে পারিল না, কারণ এই সময়েই তাহাদের রাজপুত্র হেমেন্দ্র পিতৃরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজ্য মধ্যে এক আনন্দোৎসব হয়, সেই উৎসবে প্রায় মাসাধিক কাল রাজবাড়ীতে নাচগান, আতস

এই রাজপুত্রের কথা আগেই বলেছি, ছয় মাসের বেলায় রাজা তাহাকে তাহার মাতার নিকট রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, সেই ছয়মাসের শিশুকে সুন্দর সুপুরুষ দেখিয়া রাজার আহ্লাদের সীমা রহিল না, তাহার জননীকেও আনাইয়া অন্তঃপুরে স্থান দিলেন, তিনিই রাজ্যেশ্বরী হইলেন। যবদ্বীপ-বাসীর আহ্লাদের সীমা রহিল না, পূর্ব্বাবধি রাজার যে সকল রাণী ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও পুত্রকন্যা জন্মে নাই, পাছে এই শিশুপুত্রকে আনিলে অন্যান্য রাণীগণ দ্বেষ ঈর্ষার বশে তাঁহার প্রাণনষ্ট করেন, তজ্জন্য তিনি নূতন রাণীকে তাঁহার পিতৃভবনে রাখিয়া আসিয়াছিলেন—মাস মাস খরচ-পত্র পাঠাইয়া দিতেন।

রাজপুত্র বড় হইয়া যখন সেই পাথর সরাইতে পারিলেন, তখন তাঁহার জননী "হৃষ্টমতী" তাঁহাকে সেই মাটীচাপা তলোয়ার ও জুতা জোড়াটী লইয়া পিতৃসকাশে যাইতে বলিয়া দিয়াছিলেন, পথের মধ্যে চোর ডাকাত, রাক্ষস খোক্কস, বাঘ ভালুকের যে কত ভয়, তা' বলা যায় না, রাজপুত্র সেই তলোয়ারের বলে সকলকে নষ্ট করিয়া, পিতৃ-রাজধানীতে আসিতে পারিয়াছিলেন। রাজধানীতে পৌঁছিয়া রাজকুমার আত্ম পরিচয় দেওয়ায় এবং সেই স্বহস্তের তরবারী ও পাদুকা দেখিয়া, রাজা তাঁহাকে পুত্র বলিয়া চিনিয়াছিলেন।

উৎসব শেষ হইতে না হইতে বোর্ণিওর রাজা প্রতাপাদিত্য পুত্রের প্রত্যাগমনের দিন গণনা করিতেছিলেন। একদিন হঠাৎ একদল পথিক তাঁহার নিকটস্থ হইয়া জানাইল যে তাহারা তাঁহার

বিলম্ব না করিয়া আপনার পুত্রের মৃতদেহ আপন রাজ্যে আনিয়া তাহার সৎকার করিলেন, তাহার হত্যাব্যাপার জানিতেও তাঁহার বাকী রহিল না। পুত্রহত্যার পরিশোধ লইবার জন্য কিছুমাত্র বিলম্ব সহিল না, রাজা প্রতাপাদিত্য প্রস্তুত হইলেন, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনি যবদ্বীপ আক্রমণ করিলেন, তখনও যবদ্বীপবাসী উৎসবে মত্ত। শত্রুর আগমনে উৎসব বন্ধ হইল, যবদ্বীপের সকলকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বেই শত্রুসৈন্য পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় ঘেরিয়া রহিল। প্রতাপাদিত্য তথায় তাঁবু ফেলিয়া তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" প্রতিজ্ঞা, যবদ্বীপে যে কোন প্রকারেই হউক, আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবে। রাজা ধীরেন্দ্র সিংহের এক বর ছিল, তাঁহার মস্তকের শিখা না পাইলে কেহ তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না, তাহা ব্যতীত তাঁহার প্রাণও নষ্ট হইবে না। এ বড় কঠিন সমস্যা। একদিন রাজকন্যা "অঙ্গনা সুন্দরী" পিতার দুর্গশিখর হইতে রাজা প্রতাপাদিত্যকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মোহিত হইলেন, সেরূপ সুন্দর পুরুষ কখন রাজকন্যার নেত্রগোচর হয় নাই। প্রতাপকে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কিরূপে তাহা হয়, প্রতাপ দেশের শত্রু, পিতার শত্রু। দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল, রাজকন্যার ততই মোহ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—পাখী হইলে উড়িয়া গিয়া তাঁহাকে

পরিপূর্ণ—এক দণ্ডের জন্য পিতাকে দেখিতে না পাইলে, পিতৃ-শুশ্রূষা করিতে না পাইলে, তিনি অস্থির হয়েন, এদিকে তাঁহার পিতৃশত্রুকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়াছেন। অঙ্গনা কয়েকদিন ধরিয়া আপন মনে অনেক তোলা পাড়া করিয়া অবশেষে একদিন রাত্রিকালে চুপে চুপে তাঁহার পিতার শিখা-চ্ছেদ করিলেন, এবং ধীরে ধীরে শত্রু রাজার তাম্বুতে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অঙ্গনার পদশব্দে রাজার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি রাজকুমারীকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহাকে গুপ্তঘাতক বোধে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং শয্যাতল হইতে অস্ত্র বাহির করিবেন এমন সময় রাজকন্যা বলিলেন—"আমি এদেশের রাজার কন্যা, আপনার মঙ্গলের জন্য পিতার শিখাচ্ছেদ করিয়া আনিয়াছি, বোধ হয় আপনি জানেন, এই শিখা না পাইলে আপনি কোনক্রমেই রাজ্যাধিকারে সমর্থ হইবেন না। ইহার পুরস্কার আমি আপনার ভালবাসা চাই। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন, যেন বঞ্চিত না হই।"

রাজা প্রতাপাদিত্য রাগে জ্বলন্ত আগুনের মত হইয়া বলিলেন—"তুমি দূর হও, আমার নজর ছাড়িয়া চলিয়া যাও, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। যে একজন অপরিচিতের প্রণয় প্রত্যাশায় আপনার পিতৃজীবন ও স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, সে কোনমতে বিশ্বাসযোগ্যা নহে, তুমি সব করিতে পার, শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও, আমি স্ত্রীহত্যার পাপভাগী হইবার ইচ্ছা করি না।" এই কথা বলিতে বলিতে কাক

পূর্ব্বে রাজা প্রতাপাদিত্য সেনাপতিগণকে প্রস্তুত হইবার আজ্ঞা দিলেন, এবং রাজশিখার অপেক্ষা না করিয়া আপন বাহুবলে যবদ্বীপ অধিকার করিলেন। যে পর্য্যন্ত সমস্ত লোক বশ্যতা স্বীকার না করে, সে পর্য্যন্ত সেনা ও সেনাপতিগণকে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ রাখিবার আদেশ দিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিবার জন্য জাহাজারোহণ করিলেন। রাজপুত্রী অঙ্গনা কূলে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে রাজা প্রতাপাদিত্যের পানে চাহিয়া রহিলেন, যখন কূল ত্যাগ জন্য জাহাজ ছাড়িবার উদ্যোগ হইল, তখন সে সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিয়া—জাহাজের হাইল ধরিয়া এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"আমাকে সঙ্গে লও রাজা, আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, রাজসুখ চাহি না, আমি তোমার জন্য পিতামাতাকে ছাড়িয়াছি, স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছি।"

রাজা তাহার মুখের দিকেও চাহিলেন না, জাহাজের মাঝি মোল্লারা তাহাকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিল, সে ডুবিয়া গিয়া এক পেট জল খাইয়া ফেলিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার দেহ হালকা হইয়া আসিল, সে পাখীর মূর্ত্তি ধরিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল। যেস্থান হইতে সে সর্ব্বাগ্রে রাজা প্রতাপকে দেখিয়াছিল, সেই স্থানে পদাঘাত করিতে করিতে আপন জীবনে ধিক্কার দিতে লাগিল, অন্যান্য পক্ষীর সহিত সে মিশিতে গেল, তাহারা তাহার সকল কথাই জানিত, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না, একাকিনী বায়ুপথে পক্ষীরূপিনী অঙ্গনা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তরুলতা পাহাড়

শত্রু সৈন্যগণকে বেশীদিন অবরুদ্ধ রাখিতে হইল না—নগরবাসিদের রসদ ফুরাইয়া আসিল, খাদ্যাভাবে শত শত লোক মরিল, কতশত আধমরা হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

একদিন দৈববাণী হইল—"রাজা প্রতাপের সঙ্গে সন্ধি কর, তিনি যা' চা'ন তাই দিয়া, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর, নতুবা নিস্তার নাই। তোমাদের সকলকেই প্রাণ হারাইতে হইবে।"

যবদ্বীপবাসিরা সম্মত হইল, রাজা প্রতাপাদিত্যের শরণ লইল, কি উপায়ে দেশ রক্ষা পায়, তাহারই প্রস্তাব হইল। রাজা প্রতাপ বলিয়া পাঠাইলেন—পুত্রশোকে আমার অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, আমার সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রকে যাহারা নষ্ট করিয়াছে, প্রতি বৎসর তাহারা যদি সাতটী সুন্দরী দম্পতি আমাকে পাঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমার রাজ্য হইতে যে সাতটী যুবক ও সাতটী যুবতী রাক্ষস "গজদন্তকে" খাদ্য স্বরূপ দিতে হয়, তাহাদের জীবন রক্ষা পায়। অতএব যদি তোমরা প্রতি বৎসর সাতটী হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ স্ত্রী এবং পুরুষ যবদ্বীপ হইতে পাঠাও, তাহা হইলে তোমাদের দ্বীপ তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিতে পারা যায়। যবদ্বীপবাসিরা কি করিবে, উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তাহাতেই সম্মত হইল।

প্রতি বৎসর একটী মেলায় যবদ্বীপের যাবতীয় হৃষ্ট পুষ্ট যুবক যুবতী সমবেত হইয়া স্ফূর্ত্তি দ্বারা সাতটী স্ত্রী এবং সাতটী পুরুষ নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল, তাহারাই

লাগিল। ক্রমে ব্যাপার বড়ই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। প্রতি বৎসর চৌদ্দটী নরনারীর মহামূল্য জীবন নষ্ট হইতে লাগিল দেখিয়া, রাজকুমার হেমেন্দ্র সিংহ চতুর্থ বৎসরে আপনি সাতটী পুরুষের মধ্যে একটী হইয়া যাইবেন স্থির হইল—ইহাতে হয় তিনি অপর তেরটী স্ত্রীপুরুষের সহিত প্রাণ দিবেন, না হয় আপনার দেশকে উদ্ধার করিবেন। বৃদ্ধ রাজা ধীরেন্দ্রসিংহ বার বার পুত্রকে এই বিপজ্জনক কাজে অগ্রসর হইতে বাধা দিলেন, কিন্তু রাজপুত্র কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। যাত্রার দিন অবধারিত হইল। বৃদ্ধ রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপুত্রকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। ফিরিবার সময় তাঁহার আপনার নিষ্ঠুর কার্য্য তাঁহার মনে নূতন হইয়া তাঁহাকে অসহ্য যাতনা দিতে লাগিল।

রাজপুত্র নানা উপায়ে পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া যাইলেন—"আমার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি বাল্যকালে আপনার নিকট যে দেবতার দেওয়া তরবারি পাইয়াছি, তাহাতে কত সিংহ শার্দ্দূল রাক্ষস খোকশ বধ করিয়াছি, এবারেও বোর্ণিওর রাক্ষস নষ্ট করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। এতদিনে রাক্ষস গজদন্তের আয়ু শেষ হইয়াছে।"

পথিমধ্যে রাজপুত্র সঙ্গিগণকে সাহস দিতে লাগিলেন—"তোমাদের ভয় নাই, আমি তোমাদের সকলকেই বাঁচাইয়া লইয়া দেশে ফিরিব।" কিন্তু তাহাদের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না, তাহারা শুনিয়াছিল—রাক্ষস গজদন্ত যে একটী

কেহই বাহিরে আসিবার পথ পায় না, রাক্ষসে না মারিলেও যে যায়—সেই অনাহারে মরিয়া যায়। ইহাতে রাজ-পুত্রের ভয় হইল। যাহাই হউক, তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া যথাসময়ে বোর্ণিও দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। রক্ষীগণ তাহাদিগকে যখন রাজার নিকটে লইয়া গেল, তখন রাজকন্যা "লাবণ্যবতী" সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, রাজপুত্র হেমেন্দ্রকে দেখিয়া, তাঁহার মনে বিশেষ দয়ার সঞ্চার হইল। রাজাও বন্দিগণকে দেখিয়া কাতর হইলেন, যখনই তাঁহার মন কাঁদিয়া উঠে, তখনই তাঁহার মৃত পুত্রের মুখখানি মনে পড়িয়া আবার মন ফিরিয়া দাঁড়ায়। রাজকন্যা যখনই মনে করেন যে, তাহারা আগামী কল্য গজদন্তের পেটে যাইবে, তখনই তাঁহার মন ব্যথিত হয়।

রাজা বন্দী ও বন্দিনীগণের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যখন কুমার হেমেন্দ্রের উপর দৃষ্টি পড়িল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ইনি যবদ্বীপের রাজপুত্র নয়?"

হেমেন্দ্র অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"আজ্ঞা হাঁ, আমি আপনার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে, আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ আজি রাত্রিতে এখানে যেন ঘুমাইতে পায়, আমি একাকীই আজি গজদন্তের ভক্ষ্য হইব।"

রাজা বলিলেন—"তুমি একাকীই মরিতে চাও? আচ্ছা, তাহাই হইবে। তোমাকে আজি রাত্রিতেই গজদন্তের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।"

এই কথা রক্ষীগণকে বলিয়া দিয়া, রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ

সহায়তা না করিলে রাজপুত্রের প্রাণরক্ষা হইবে না, অতএব আমাকে তাহা করিতেই হইবে।

ইহা স্থির করিয়া, তিনি রাজপুত্রের সহিত গজদন্ত রাক্ষসের গোলোক ধাঁধার দ্বার পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গমন করিলেন। রাত্রি অন্ধকার, আকাশ যেন রাজপুত্রের অবস্থা দেখিবার জন্য হাজার হাজার চক্ষু মেলিয়া দেখিতে লাগিল। আকাশ নক্ষত্র-ময়, মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছিল। কোকিল, বৌ-কথা কও, পাপিয়া পক্ষীরা গান করিতেছিল, এমন সুখের সময়ে রাজ-পুত্রের মৃত্যুকাল নিকট ভাবিয়া, কুমারী লাবণ্যবতীর নির্ম্মল নীলাময় চক্ষু দুটী জলে ভাসিয়া গেল, তিনি ধীরে ধীরে রাজপুত্রের নিকটে আসিয়া চুপে চুপে একগাছি শক্তলাল-সূতা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"প্রবেশদ্বারে ইহার একটী দিক বাঁধো, আর ডাইন হাতে সূতাগাছটী ধরিয়া যাইবার সময় স্থানে স্থানে ইহা দেওয়ালের গায়ে বাঁধিয়া যাইও। তোমার দেহ বেশ সুস্থ, স্বচ্ছন্দ ও বলিষ্ঠ, হাতে যে শাণিত অস্ত্র দেখিতেছি, ইহা দ্বারা তুমি অনায়াসেই গজদন্তের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিবে। তাহার মাথা কাটিয়া আসিবার সময় এই সূতাগাছটী ধরিয়া চলিয়া আসিবে, তাহা হইলে আর তোমাকে পথ হারাইতে হইবে না।"

রাজপুত্র রাজকন্যাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বলিলেন—যদি বাঁচিয়া ফিরিতে পারি, আপনার কেনা হইয়া থাকিব। এই বলিয়া গজদন্তের গোলোক ধাঁধা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময় রাজকন্যার উপদেশমত যেখানে সুবিধা পাইলেন,

লাগিলেন। কিন্তু পথ এরূপ দুর্গম ও অন্ধকারময় যে, তাঁহাকে অতিকষ্টে রাজকন্যার উপদেশ মত কাজ করিয়া যাইতে হইল। অনেকক্ষণ কষ্ট ভোগের পর, তিনি গোলোকধাঁধার ভিতরের উঠানে গিয়া পৌঁছিয়া দেখিলেন, গজদন্ত সেখানে পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে, সে জানিত না যে, আজি রাত্রিতে তাহার খোরাক আসিবে।

রাজপুত্র ধীরে ধীরে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গজদন্তের চেতনা নাই, মড়ার মত পড়িয়া ঘুমাইতেছে, হাত পা নড়ে চড়ে না, কেবল নাসায় নিশ্বাস বহিতেছিল, তাহাতেই সেই স্থানের নীরবতা নষ্ট হইতেছিল। রাজপুত্র সেই দিব্যাস্ত্র বাহির করিয়া এক আঘাতেই গজদন্তের মস্তকচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। তাহার ছিন্নমুণ্ড মাটীতে লাফাইতে লাগিল। মনুষ্য-দেহ অপেক্ষা রাক্ষসের দেহ কত বড়, মনুষ্যের শরীরে যত রক্ত, তাহা অপেক্ষা রাক্ষসের দেহে কত রক্ত ধরে। রাক্ষসের রক্তে গোলোক ধাঁধার উঠানটা ভরিয়া গেল। রাজপুত্র অন্ধকারের ভিতর দিয়া রাজকন্যার দেওয়া সেই সূতাগাছটী ধরিয়া গোলোক ধাঁধার ভিতর পথে অগ্রসর হইয়া, ক্রমে বাহিরে আসিলেন এবং আকাশে নক্ষত্ররাশি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল। রাজকন্যা সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া, তিনি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—"আপনি না থাকিলে আমি গোলোক ধাঁধার ভিতর হইতে বাঁচিয়া আসিতে পারিতাম না—চিরজীবনের জন্য আপনার

মনে একটুও সন্তোষ জন্মে তাহা বলুন, আমি এখনি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। ফিরিবার সময় প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মনে হইয়াছিল যে, এইবার বুঝি থাই হারাইয়া প্রাণে মরিলাম।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। রাজকন্যা তাঁহার জন্য খাদ্য পানীয় আনিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে সে সমস্ত আপন হাতে খাওয়াইয়ালেন, আহার করিয়া রাজপুত্র সুস্থ হইলেন। রাজকন্যা বলিলেন, "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আপনার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণকে লইয়া রাত্রি থাকিতেই জাহাজে উঠুন।"

রাজপুত্র বলিলেন—"আপনি কোথায় থাকিবেন?"

রাজকন্যা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনাকে দেখিয়া অবধি আপনার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, এখন যদি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লয়েন, তাহা হইলে যবদ্বীপের রাজবধূ হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি।"

রাজপুত্র আহ্লাদে অধীর হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার গলদেশে আপনার বাহুদুটী জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার এমন ভাগ্য হবে যে, আমি আপনাকে রাজবধূ করিয়া কৃতজ্ঞতাঋণ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তি লাভ করিতে পারিব?"

রাজকন্যার অশ্রুজলে রাজপুত্রের বাহুযুগল সিক্ত হইল। তখন তাঁহারা আর বিলম্ব করিলেন না, যথা সত্বর সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণকে জাগাইয়া জাহাজে উঠিলেন। যবদ্বীপের

জাহাজ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বোর্ণিও ছাড়িয়া যেন বায়ুভরে উড়িয়া চলিল। রাজপুত্রের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া যবদ্বীপবাসী বালক বনিতা বৃদ্ধ সকলেই সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজধানীতে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। রাজপুত্র যখন বধূ লইয়া আসিয়াছেন সকলে শুনিল, তখন তাহাদের আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল। বৃদ্ধরাজা ও রাণী আসিয়া রাজবধূকে অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন, রাজবাড়ীর স্ত্রীলোকেরা রাজপুত্রকে বধূর সহিত দণ্ডায়মান করিয়া তাঁহাদের বরণ করিলেন। বৃদ্ধরাজা দুই তিনদিন মধ্যে রাজপুত্রকে রাজ্যভার দিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে মন দিলেন। রাজরাণী হইয়া রাজবধূ পিতাকে সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনিও তাহাতে খুব আনন্দিত হইলেন; কারণ গজদন্তের উপদ্রব হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার প্রজাগণ সুখে কালাতিপাত করিতে পাইল। ইহার পর বোর্ণিও ও যাবাদ্বীপে আর বৈরীভাব রহিল না।

ফুল ঝুর-ঝুরি।

এক গ্রামে এক কৃষক বাস করিত। কৃষক-পত্নী উপর্য্যুপরি ছয়টী কন্যা প্রসব করিল দেখিয়া, কৃষক বড়ই দুঃখিত ও রাগত হইল, প্রতিজ্ঞা করিল,—এবার যদি কন্যা হয়, তা হ'লে তাকে কেটে ফেল্‌বো।

কৃষক-পত্নী যথাকালে অন্তঃসত্ত্বা হইল। যখন পূর্ণগর্ভা, তখন সে হাটে গিয়াছিল, হাট হইতে একটা বনের ধার দিয়া আসিবার সময় তাহার প্রসব-বেদনা ধরিল, সে আবার এক কন্যা প্রসব করিল; ভাবিল, কন্যাকে ঘরে লইয়া যাইলে, কৃষক নিশ্চয় তাহাকে হত্যা করিবে, যদি ভগবান বাঁচান, এইখানেই কোন রকমে বেঁচে থাক্‌বে। কাজ নাই ঘরে নিয়ে গিয়ে। এই ভেবে কৃষক-পত্নী মেয়েটীকে সেইখানে ফেলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল। বাড়ীতে ফিরিয়া স্বামীকে বলিল—"নদী পার হয়ে আসবার সময় প্রসব-বেদনা ধরিল, ডাঙ্গায় উঠতে না উঠতে জলের উপর একটী পুত্রসন্তান প্রসব, কল্লেম, কিন্তু ছেলেটী জলে ডুবে গেল, হাতাড়ে হাতাড়ে অনেক খুঁজলাম, পাওয়া গেল না—কি কর্‌বো, আমাদের কপাল মন্দ, বাঁচবে কেন?

এদিকে বনের ধারে মেয়েটী হাত পা নাড়্‌তেছিল, বন হ'তে একটা বাঘ আর বাঘিনী চরতে বেরিয়ে দেখ্‌লে, দিব্য একটী সুন্দরী কন্যা। বাঘটা খেতে গেল, বাঘিনী বল্লে, আমার ছেলে পিলে নাই, আমি একে পুষবো। বাঘ রাজি হলো—

দুধ এনে খাওয়াতে লাগলো। বাঘের দুধের ভাবনা কি—গয়লা দুধের ভার নিয়ে যাচ্চে, তাকে তাড়া দিলে, সে দুধের ভার ফেলে পলায়, দুধের অভাব কি—কত দুধ খাবে খাউক না। মেয়েটী যখন সপ্ত মাসের হলো, তখন বাঘিনী বাঘকে বল্লে—"আচায্যি ডেকে মেয়ের ভাল নাম রাখ্‌তে হবে।" বাঘ এক-দিন একজন আচায্যিকে পাঁজি বগলে ক'রে যেতে দেখে, তা'র কাছে গিয়ে বল্লে—"ঠাকুর, পালিও না, আমার মেয়ের একটী ভাল নাম রাখ, মেয়ে যদি সুলক্ষণা ও বড় হয়ে বেঁচে থাকে, তাহ'লে তোমাকে বড়মানুষ করে দিব—আজ দশটী টাকা তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি, এই নাও, ব'লে টাকা দশটী দিল।

আচার্য্য গণনা করে বল্লে, যেদিন হ'তে মেয়ের পেটে ভাত পড়বে, সেই দিন থেকে এ কথা কহিলে ফুল পড়বে, অতএব এর নাম থাকুক "ফুল ঝুরঝুরি।" আচার্য্য বিদায় লইল। একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে সমারোহে আহারের অনুষ্ঠান হয়েছে, লোক-জন অনেক খাবে, কুটুম্ব সজ্জনের জন্যে রূপার থালায় অন্ন ব্যঞ্জন, পায়স পিষ্টক সাজান হয়েছে, বাঘ বাড়ীর পাশে ওত করিয়া বসিয়াছিল, সব প্রস্তুত—এমন সময় সে লাফ দিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া থালাশুদ্ধ সব নিয়ে বনে গেল, বাঘিনীকে থালা দিল, বাঘিনী অতিযত্নে ভাত আর পায়স মেয়েটীর মুখে দিল। তখন তার দাঁত হয় নাই—গিলিয়া গিলিয়া দুটী ভাত খাইল, সেই দিন হইতে তার ফুল ঝুরঝুরি নাম সার্থক হলো। কথা কহিলে অতি সুন্দর এক রকম ফুল পড়ে—যেমন ফুল

গুলি ৬।৭ দিন বেশ থাকে, শুকায় না। আচার্য্য ব্রাহ্মণ একদিন বনের ধার দিয়ে যাচ্ছিল, বাঘিনী তাঁকে ডেকে বল্লে—"ঠাকুর, তোমার কথা ঠিক হয়েছে। আটদিনের দিন একবার আমাদের বনে এসো, বাঘ তোমাকে খুব টাকা দিবে, তুমি মুটে সঙ্গে এনো।"

বাঘ চরিয়া বনে আসিলে, বাঘিনী আচার্য্যের কথা বলিল— এতদিন বাঘ বাঘিনী দুজনে একসঙ্গে চরিতে যাইত, কিন্তু ফুল-ঝুরঝুরিকে পাইবার পর স্ত্রীজাতির মন, বাঘিনী হইলেও কোমল, মেয়েটীর কাছ ছাড়া হতো না। পরদিন বাঘ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিল, রাজার খাজনা লইয়া ৭।৮ জন পাইক যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে একজন জমাদার। বাঘ তাহাদিগকে তাড়া করিল, বাঘের কাছে জমাদার কি কর্‌বে, টাকার তোড়া ফেলিয়া তাহারা পলাইল, বাঘ তোড়াগুলি লইয়া বনে আসিল, পরদিন আচার্য্য ঠাকুর আসিলে টাকার তোড়াগুলি তাঁহাকে দিল, আচার্য্য দুজন মাত্র মুটে আনিয়াছিলেন, আরও ২।৩ জন মুটে আনিয়া টাকাগুলি বাড়ী লইয়া গেলেন।

মার মন নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে কি? কৃষকপত্নী মাঝে মাঝে হাটে যাবার আসবার সময় বনের ধারে এসে কাঁদতো—যখন ফুল-ঝুরঝুরি বড় হইল, তখন তার কান্না শুনে বন থেকে বেরিয়ে আসতো, মায়ে ঝিয়ে দেখা হতো। ফুল-ঝুরঝুরি বাঘকে বল্লে টাকা পেতো, সেই টাকা মাকে দিত, মা সে সব বাড়ীতে এনে খরচ পত্র করতো, কৃষক বুড়ো হয়েছিল, তার সেবা কত্তো।

মোটা হইল—তাকে দেখতে খুব সুন্দরী, রং টকটকে—যেন কাঁচা সোনা। চোখ দুটী ভাসা ভাসা, কান পর্য্যন্ত টানা, নাকটী টিকোলো, ছিদ্র দুটী ছোট ও মাথায় একমাথা চুল, ভুরু দুটী খুব ঘন—কান পর্য্যন্ত লম্বা ও বাঁকা, যেন ধনুকখানি, ঠোঁট সরু টুকটুকে যেন পাকা তেলাকুচা ফল। ক্রমে ফুল-ঝুরঝুরির বয়স ১২।১৩ বছর হলো, একদিন সে দীঘির ধারে বসে আছে, এমন সময় একটা তীর এসে দীঘির জলে পড়লো—সে দেশের রাজপুত্র মৃগয়া কত্তে এসেছিলেন, পিপাসায় অস্থির হয়ে কতদূরে জল আছে জানবার জন্য তীর ছুড়েছিলেন, সেই তীরটী দীঘির জলে পড়িল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাজপুত্র দীঘির ধারে এসে জল খেলেন, জল খেয়ে চারদিক চেয়ে দেখেন, ফুল ঝুরঝুরি একটী গাছতলায় আলো করে বসে আছে। সে বড় হওয়া অবধি বাঘিনী বাঘের সঙ্গে চরিতে যাইত, তখন সেখানে বাঘ বা বাঘিনী কেহই ছিল না। রাজপুত্র ফুলঝুরঝুরিকে বিবাহ করিবার কথা বল্লে, সে রাজি হয়ে রাজপুত্রের সঙ্গে চলিয়া গেল, কিন্তু বাল্যকালে যে ভালবাসে, প্রতিপালন করে, মানুষ তাকে ভুলিতে পারে না—বাঘ ও বাঘিনীর জন্যে তার মন কেমন কত্তে লাগলো। পথের মাঝে এক নদী, মাঝীকে বলবা মাত্র সে তাদিগকে নদী পার করে দিল। রাজপুত্র ফুল-ঝুরঝুরিকে রাজবাড়ীতে না নিয়ে গিয়ে আপনার এক নাপতি-নীর বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। সেইখানে আসিয়া সমারোহে রাজপুত্রের সহিত ফুলঝুরঝুরির বিবাহ হইবার স্থির হইল। রাজ-পুত্র বাড়ীতে গিয়া তাঁহার মাতা রাজরাণীকে সব কথা বলিলেন। রাণী রাজাকে বলিলেন। বিবাহের ঠিক ঠাক হয়ে

গেল। রাজপুত্র বিবাহ কত্তে এসে দেখেন যে কন্যা ঘোমটা দিয়ে বসে আছে, সে ফুলঝুরঝুরি নয়, রাজপুত্র তা'কে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কথা কও দেখি? সে কথা কহিল না, কহিবে কি, সে যে নাপতিনী নিজে, সে ফুলঝুরঝুরিকে কেটে আপনি তার গহনা কাপড় পরে বসেছিল। যাই হোক, রাজপুত্র তা'কেই বিয়ে করে ঘরে আনলেন, আসিবারসময় নাপতিনীর ঘরে একটী অপূর্ব্ব পদ্মফুল দেখে তিনি সেই ফুলটী বাড়ী লইয়া আসিলেন, বৎসর গতে নাপতিনীর একটী পুত্র হইল—তখনও সেই অপূর্ব্ব পদ্ম মলিন হইল না দেখিয়া, নাপতিনী তাহা ছিড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সারগাদায় ফেলিয়া দিল। সারগাদায় একটী ডালিম গাছ হইল, ক্রমে গাছটী বড় হইল, গাছভরা ডালিম হইল, পাকিল, অপূর্ব্ব স্বাদ, এমন ডালিম কেহ কখন খায় নাই—যে খাইল, সে আর ভুলিতে পারিল না। সব ফুরাইল, রাজবাড়ীর মালিনী সে সংবাদ পাইয়া রাজবধূকে বলিল—মা, আমি নিত্য ফুল যোগাই, আর একটা ডালিমও খেতে পেলুম না, রাজ্যি শুদ্ধ লোক বল্‌চে, এমন ডালিম কেউ কখন খায় নাই। রাজবধূ দাসীকে বলিলেন—সত্যিইতো, ফুলউলি ডালিম খেতে পেলে না, আর দেশশুদ্ধ লোক খেলে!"

দাসী একটা কাণা ডালিম এনে ফুলউলির হাতে দিল। ফুলউলি ভাবিল, এ কানা ডালিমতো খেলেই ফুরুলো, একটী গাছ করবো যে, দশজনে ফল খেয়ে আরাম পাবে। এই ভেবে হাঁড়ীর ভিতর পূরে রেখে দিল, বর্ষা হইলেই বীজ পুঁতিবে। ফুলউলি ফুল যোগাতে যায়, এসে দেখে, সরু চেলের ভাত,

আশ্চর্য্য, কে রাঁধিল, কোথা হইতে আসিল,—যাই হউক, এত বেলায় আর রাঁধা যায় না। পণ্ডিতেরা বলেন—তৈরি খাবার ছাড়বে না। মালিনী ভাত খাইল, এমন অন্ন ব্যঞ্জন সে কখন খায় নাই—যেন অমৃত। পরদিনও ফুল যোগাইয়া আসিয়া সেইরূপ অন্নব্যঞ্জন পাইয়া খাইল। তিনদিনের দিন সে সকাল সকাল ফুল যোগাইয়া বাড়ী আসিল, কিছুক্ষণ লুকাইয়া থাকিয়া দেখিল—এক পরমা সুন্দরী কন্যা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে—মালিনী তাহা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল—"কে মা তুমি, আমার ছেলে নাই, মেয়ে নাই—তুমি আমার মেয়ে, আমার ঘরে থাক, খাবার পরবার কোন কষ্ট পাবে না, তুমি যে জাতি হও, আমি যখন মেয়ে বলেছি, তখন তোমার হাতে আমি খাবো।"

ফুল ঝুরঝুরি কথা কহিবা মাত্র তাহার মুখ হইতে এক নূতন রকমের ফুল পড়িতে দেখিয়া মালিনী ভাবিল—নিশ্চিত কোন দেবকন্যা হইবে। এই কন্যা সেই ফুলঝুরঝুরি—রূপের ডালি, এমন মেয়ে কেউ কখন দেখে নাই। ফুল ঝুরঝুরি আপনার পরিচয় দিল। মালিনীকে আর বাগানে বাগানে ঘুরিয়া ফুল তুলিতে হইল না, ফুল ঝুরঝুরি ফুল দেখিতেও যেমন, গন্ধও তেমন। সেই ফুলে সে মালা গেঁথে রাজবাড়ীতে দিতে লাগলো। রাজপুত্র ফুল দেখেই চিন্‌তে পাল্লেন—এ ফুল ফুল ঝুরঝুরির না হ'য়ে যায় না। তিনি মালিনীকে আসল কথা জিজ্ঞাসিলেন, সত্য কথা বলিলে পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন। মালিনী সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। রাজপুত্র মালিনীকে মাস-হরা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে ফুল ঝুরঝুরিকে ঘরে লইয়া গেলেন।

রাজরাণী করিলেন আর সেই নাপিতিনীকে "হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতিয়া ফেলিলেন।

ফুল ঝুরঝুরি রাণী হ'য়ে সুখে কালযাপন করেন, পুত্রকন্যা হয় না—কত সন্ন্যাসী ফকির আসে যায়, রাণী হাত দেখান পুত্র কন্য হবে কি না? একদিন এক সন্ন্যাসী তাঁহার হাত দেখিয়া বলিল—"কোন সজ্জাতির কন্যা যার উপর্য্যুপরি সাত কন্যা হয়েছে, একটী পুত্রও হয় নাই, এমন স্ত্রীলোক ছয় মাস কাল সেবা কল্লে তাঁহার পুত্র হবে। এ কথা রাজার কানে উঠিল, রাজা সে কথা রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া ঢোল সোহরৎ দিলে, এক কৃষককন্যা মিলিল, সে বিধবা, তাহার ছয়টী কন্যা এখনও আছে আর সপ্তমটী কি হইয়াছে সে জানে না—সেই মেয়েটী কথা কহিলে ফুল পড়িত। এই কথা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন, সেই তাঁহার বেহাইন। দণ্ড পল দেরী না করিয়া তাহাকে আনিতে পাঠাইলেন। রাজা তলব করিয়াছেন শুনিয়া সে ভয়ে অস্থির হইল, কাঁপিতে কাঁপিতে রাজবাড়ীতে গেল, রাজার বৌকে দেখেই সে চিনতে পাল্লে; রাজার বৌও মা বলিয়া চিনিলেন; তখন মায়ে ঝিয়ে গলা ধরাধরি করিয়া কান্না। দুঃখিনী কৃষকপত্নী রাজার বেহাইন হইবে কে ভাবিয়াছিল! কৃষক-পত্নী রাজার অন্তঃপুর স্থান পাইল, রাজবধূকে কন্যার মত খাওয়াইতে পড়াইতে লাগিল। ছয় মাস পরে কন্যা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন, রাজাও রাজপুত্রের আহ্লাদের সীমা রহিল না। দশমাস দশদিনে তিনি একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই আহ্লাদের সংবাদ রাজ্যমধ্যে ঘোষণা হইল।

বাঘ ও বাঘিনীকে ফাঁদে ধরিয়াছিল, তাহারা সেই দুইটাকে আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা তাদিগকে পশুশালায় রাখিয়া দিলেন। রাজবধূ প্রসবের পর সেই পশুশালা দেখিতে গিয়া, বুড়া বাঘ ও বাঘিনীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, সেই বাঘ ও বাঘিনী বাল্যাবস্থায় বনে তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিল ; বাঘ বাঘিনীও তাঁহাকে দেখিয়া ল্যাজ নাড়িতে লাগিল, যেন তারা বাহিরে আসিতে পাইলে তাঁহাকে স্নেহ যত্ন দেখায়। ফুল ঝুরঝুরির চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কে বলে, পশু পক্ষীর জ্ঞান নাই? যদি না থাকিবে, তবে তাহাদিগকে যা শিখাও কেমন করে তা শিখে, পশুপক্ষীর জ্ঞানবুদ্ধির কত কথা শুনা গিয়াছে। তা'দের যে ভগবদ্দত্ত জ্ঞানটুকু আছে তাহাই তাদের পক্ষে প্রচুর।

ফুল ঝুরঝুরি জমাদারকে বলিলেন,—"আমার ভাগ্যে যাই থাকুক, বাঘ ও বাঘিনীর কাতরতা আমার সহ্য হচ্চে না। পিঁজড়ার দোর খুলে দাও, ওরাই আমার প্রাণ রেখেছিল। আজ যদি ওরা আমার দেওয়া প্রাণ লয় লউক।" এই কথা শুনিয়া বাঘ ও বাঘিনী কাতর স্বরে চেঁচাইতে লাগিল, তাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। জমাদার পিজড়ার দোর খুলে দিল। বাঘ ও বাঘিনী ফুলঝুরঝুরির পায়ের কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগলো, তার পা চাটিতে লাগলো, দেখে সমস্ত লোক অবাক! ফুলঝুরঝুরি তাদের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বল্লে—তোমাদের গলায় সোণার শিকল দিব, পেটপূরে খেতে দিব, ছেলে মেয়ে যেমন বাপ মার সেবা যত্ন করে, আমিও সেই রকম করবো। সেইদিন তাদের জন্যে সোণার পিজড়ে

সোণার শিকল তৈয়ার হলো। তারা আলাদা ঘরে গেল। তাদের জন্যে দুটো চাকর বাহাল হলো। বুড়া বয়সে অশক্ত বলেই শীকারী তা'দিগকে ফাঁদে ফেল্‌তে পেরেছিল। শেষ-দশায় বাঘ ও বাঘিনীকে খেতে না পেয়ে মরতে হতো—তা' আর হলো না। বাঘ ও বাঘিনী মরিলে তাদিগকে মাটী দিয়ে তার উপর মন্দির তৈয়ারি হলো, মন্দিরের দোরের উপর বাঘ ও বাঘিনীর স্নেহ মমতার কথা লেখা রহিল।

পুণ্যের পুরস্কার।

অনেক দিন হলো এক গ্রামে কেবল নিষ্ঠুর নির্দয় লোক বাস করিত, একজনও ভাল মানুষ ছিল না—দুরাত্মারা, কেহ গ্রামে আসিয়া আশ্রয় চাহিলে দিত না—ভিক্ষুক আসিয়া মুষ্টি ভিক্ষাও পাইত না, শুধু কি তাই, গ্রামের ছেলে বুড়ায় তাহাদের উপর ইট পাটকেল ছুড়িত, ময়লা ছড়াইত, ডেলাইতে ডেলাইতে তাহাদের পিছু পিছু ছুটিত, বিদেশী লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে গ্রাম ছেড়ে পলাইত। দয়া কেমন তাহারা জানিত না। কেবল এই গ্রামের একধারে হীরু ও দীনু স্ত্রীপুরুষে বাস করিত—তাদের ঘর বাড়ী মাটীর, খড়ে ছাওয়া। তাদের বয়স হয়েছিল, বৃদ্ধাবস্থা, অতি গরিব—কিন্তু দুঃখী হলেও তারা অসুখী নয়, সদা প্রফুল্লমনে কাল কাটাইত, কি করিবে দুঃখী দরিদ্র বলে তারা কখন চোখের জল ফেলিত না—বুঝিত যে, মানুষ ভগবানের উপর কিছু করিতে পারে না, সুখদুঃখের

মালিক তিনি, যে যেমন কর্ম্ম করে, তাকে তিনি তেমনি ফল দেন। পূর্ব্বজন্মে তারা ধন দান করে নাই বা করিতে পারে নাই, তাই এ জন্মে তাদের দুর্গতি। একদিন সন্ধ্যাকালে দুজন অতিথি গ্রামে আসিল, তাদের মধ্যে একজনের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ, মাথায় জটা, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, রূপ যেন ফেটে পড়চে—মুখখানি সদাই হাসি হাসি, দেখলে মনে হয় যেন দয়ার অবতার, গলায় ও মাথায় দুটী সাপ। অন্য লোকটীর বয়স কিছু কম—তাঁহাকে দেখিলে শত্রুরও ভক্তি শ্রদ্ধা হয়, টকটকে রং, মাথায় বাউরি চুল, বেশ সরু কাল কুচকুচে গোঁপ, চক্ষু দুটী ভাসা ভাসা, যেন সাক্ষাৎ দেবতা।

তাঁরা গ্রামের যে বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ কল্লেন, সে বাড়ীর লোক তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল না, গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। তাঁরা অন্য বাড়ীতে গেলেন, সে বাড়ীতেও সেই ব্যবস্থা, বেশীর ভাগ কতকগুলি ছেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ভেঙ্গাইতে ভেঙ্গাইতে তাঁদের পিছু লইয়া, চীৎকার কত্তে কত্তে ছুটলো। তাদের দেখাদেখি পাড়ার সমস্ত ছেলে এসে জুটলো, সকলে মিলে হো হো কর্ত্তে লাগিল, অতিথি দুটীকে বিব্রত করে তুল্লে। সমস্ত দিনের দুঃখ মেহনতের পর হীরু দীমু আপনাদের ঘরে এসে জুড়াইতেছিল, এমন সময় দুষ্টদের চীৎকার তাদের কাণে পৌঁছিল, তারা স্ত্রী-পুরুষে দোরগোড়ায় এসে পথিক দুটীকে দেখ্‌তে পেলে। হীরু তাঁদের কাছে গিয়ে বল্লে—"মহাশয়, আমাদের বাড়ী বড় ছোট, একখানি শোবার ঘর, তাতে আমরা স্ত্রীপুরুষে শুই, আর একখানি রান্না-ঘরটী আছে, তা'তেই রান্না হয়, যদি কষ্টস্বীকার করে থাকতে

পারেন, দয়া করে আসুন, আমাদের যেমন সঞ্চয়, তাই দিয়ে আপনাদের সৎকার করবো।

অতিথিরা আহ্লাদ ক'রে তাঁর আতিথ্যগ্রহণ কল্লেন, হীরু দীনুর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অতিথি দুইজনকে যত্ন করে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল, পা-ধোবার জল ও আসন দিয়া বসাইল, তা'রপর কিছু মিষ্টান্ন আর এক এক ঘটী জল আনিয়া দিল, অতিথিরা মুখ হাত ধুইয়া বলিলেন, সন্ধ্যা হয়েছে সন্ধ্যাবন্দনাদির পর জল খাইব। দীনু ব্যস্তসমস্ত হয়ে আসন দুখানি সরাইয়া কোশাকুশী গঙ্গাজল আনিয়া দিল, অতিথিরা সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া জলযোগ করিলেন। তাহার পর কিয়ৎকাল তাঁরা বিশ্রাম কল্লেন। এদিকে দীনুও আহারের আয়োজন করিয়া ফেলিল, পরে অতিথি দুটীর খাবার আনিয়া দিল। রুটী দুধ চিনি বই আর সন্ন্যাসিদের জন্যে কি আয়োজন করিবে। তাহাই তাঁহারা খুব আদর করে খেতে বস্‌লেন। অতিথি দুইটীর সমস্ত দিন আহার হয় নাই— বসিবামাত্র সব খাইয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া দীনু রান্নাঘরে গিয়া দেখিল, কড়াভর্ত্তি দুধ, রুটীও অনেক আছে। দীনু দুজনের জন্যে চারখানি রুটী রাখিয়া, সবই অতিথিদিগকে দিয়াছিল, দুধ একবারেই ছিল না। বাটীভরা দুধ ও রুটীরগোছা নিয়ে দীনু তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিল, তাহাও নিমেষ মধ্যে ফুরাইল, দীনুর ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত, অতিথিরা যত খায় তত আনে, দেখিয়া হীরু অবাক! ভাবিল, ইহাঁরা নিশ্চিত দেবতা হইবে, নতুবা আমার অনুষ্ঠান ত আধসের করিয়া একসের দুধ, আর আটখান করিয়া ষোলখান

রুটী, এত রুটী দুধ কোথা হ'তে আসে? অতিথিরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া গৃহমধ্যে শয়ন করিলেন, হীরু দীনু স্ত্রীপুরুষে রান্নাশালায় আশ্রয় লইল, তারা দুজনে অতিথিদের সম্বন্ধে কত কথা কহিতে লাগিল। হীরু বলিল, আমাদের দুঃখ দেখে দেবতাদের দয়া হয়েছে বলে এসেছেন।

দীনু বলিল, "দুঃখই বা কিসের, দিন আনি দিন খাই, মহাজনের খাতক নই, রাজার বাকীদার নই।"

হীরু। সে কি কথা বল, সংসারে আমাদের মত দুঃখী কে আছে? সঙ্গতি সমাবেশ নাই, দুদিন রোগে ভুগ্‌লে খেতে দিবার লোক নাই বুড়ো হয়ে আসচি, চিরদিন কি শরীর বইবে? তখনকার জন্যে সংস্থান নাই—দুটো ছেলে নাই যে উপায় করে খাওয়াবে। নিরাশ্রয়। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখ কি?

দীনু। যা বলচো তা সব সত্য কিন্তু তিনি যা করবেন তাঁর উপর কেহ কিছু কর্ত্তে পারে কি?

হীরু। তবু চেষ্টা একটা তো চাই।

দীনু। কল্লেও হয় না কল্লেও হয়।

হীরু। এ কথাটা নিতান্ত স্ত্রীলোকের মত বল্লে।

দীনু। না, এই ঠিক—যা হ'বার তা হ'বে, হাজার চেষ্টায় কিছু হ'বার নয়।

হীরু। এমন কথাও বলো—চেষ্টার ফল নাই? চেষ্টায় ভগবানের দয়া হয় না? তিনি মুখ তুলে চান না?

করচে, দিনান্তে অন্ন জুটচে না, আবার দেখ, অনেকে চেষ্টা না করেও সুখে দিন কাটাচ্চে, অধর্ম্ম অত্যাচার কত কচ্চে, তাদের ত দুঃখ কষ্ট নাই। যে পাবার হয় সে দৈবধন পায়, এতো দেখে শুনেও মান্‌বে না যে, অদৃষ্ট বলে একটা কিছু আছে! অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।

হীরু। আচ্ছা, তাই দেখা যাবে—কার কথাটা সত্য হয়।

দীনু। বেশ—তাই দেখো।

রাত্রি আধা-আধির সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, ক্রমে ঝড় বহিতে লাগিল, সমস্ত রাত্রি গোঁ গোঁ শব্দে ঝড় বহিল, গাছপালা ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িল—সমস্ত ঘর গুঁড়াগুঁড়ি হইয়া গেল, গ্রামের সমস্ত মানুষ, গরুবাছুর পশুপক্ষী মরিয়া গেল। সকাল হইল, ঝড় থামিল, অতিথি দুইজন হীরু ও দীনুকে লইয়া, নিকটে একটি পাহাড় ছিল, তাহাতে উঠিলেন; হীরু দীনু তখনও মুখে জল দেয় নাই, মুখে জল দিয়া দেখিল, অতিথি দুইটী সাধারণ মনুষ্য নহে—দেবতা, মহাদেব ও কার্ত্তিক। তাঁহারা বলিলেন, তোমাদের গ্রামের দিকে এক-বার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। তাহারা দেবাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দেখিল, একটী সুন্দর গ্রাম, প্রাতঃকালের সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করচে—সমস্তই পাকাবাড়ী, একখানিও কাঁচা ঘর নাই, দুষ্টলোকেরা সব মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের ঘরবাড়ী উড়িয়া কোথায় কি হইয়াছে, তাহার চিহ্নও নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে হীরু দীনুর ছোট বাড়ীটি ছিল, সেখানে একটী সুন্দর অট্টালিকা, তাহাতে সোণার থাম, রূপার দোর জানালা, দোরে দোরে হীরা মণি-মুক্তা ঝক্ ঝক্, [illegible]

জটাজূটধারী দেবাদিদেব মহাদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঐ যে সুন্দর বাড়ী দেখিতেছ, তোমরা যতদিন বাঁচিবে উহাতে বাস করিবে, যা চাহিবে তাই খাইতে পাইবে। যাও, উহাতে গিয়া বসবাস কর, আর তোমাদের কি চাই বল ?

দীনু স্ত্রীলোক, তাহার ইচ্ছাটা যেন একটী পুত্রবর মাগে, কিন্তু ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "না দীনু, এ বয়সে আর কেন, আমি তোমাদিগকে যে সুখ দিচ্ছি, তাহ'লে তাহা ভোগ কত্তে পারবে না। সংসারে নানা জ্বালা, তোমরা কখন তাহা ভোগ কর নাই বলে আমোদ হচ্চে, কিন্তু আমি বলি, তার কাজ নাই।"

হীরু বলিল, তবে এই বর দিন যেন, আমরা স্ত্রীপুরুষে একদিন এক সময়ে মরি, কাহাকেও কাহারও জন্য কাঁদিতে না হয়। ঠাকুর বলিলেন, "তথাস্তু।" এই বলিয়া ঠাকুর অন্তর্দ্ধান করিলেন। হীরু দীনু সেই অট্টালিকায় আসিবামাত্র দাস-দাসীরা কেহ জল আনিয়া পা ধুইয়া দেয়, কেহ পাখা লইয়া বাতাস করে, কেহ কর্পূর জল আনিয়া মুখে দেয়। খাবার সময় খাবার—চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়—সোণার থালায় অন্ন ব্যঞ্জন, সোণার বাটীতে ডাউল তরকারি পায়স পিষ্টক পর্য্যাপ্ত, তারা কত খাইবে ? এইরূপে স্বচ্ছন্দে প্রায় ১৫।২০ বৎসর গত হইলে তাহাদের মরণের দিন আসিল, তাহাদের দেহত্যাগমাত্র সে দেহের সৎকার করিতে হইল না—স্বর্গেই চলিয়া গেল।

সমাপ্ত।